উৎস মানুষ

৩৪ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি - মার্চ ২০১৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
সরস্বতী গোরা	চন্দনা মিত্র	৩
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য	ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়	৬
রোগী তো নয়	জয়দেব গুপ্ত	১৩
চলন্ত গাড়িতে বই পড়া	প্রশান্ত চক্রবর্তী	১৬
দুর্বোধ্য নিদানপত্র	গৌতম মিস্ত্রি	১৭
আমাদের হতভাগীরা	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	২২
প্রকৃতির প্রতিশোধ	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
মানুষের মূল্যবোধ কমছে	সমীরকুমার ঘোষ	২৫
চিঠিপত্র		৩০
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক: **সমীরকুমার ঘোষ**

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

মঙ্গল ও অমঙ্গল

জনপ্রিয় প্রবাদ— বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। ভারতের মঙ্গল গ্রহে রকেট পাঠানো দেখে অনেকের প্রবাদটা মনে পড়ে যেতে পারে। কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, যে দেশের অর্ধেক লোক পেটপুরে খেতে পায় না, সে দেশে মহাকাশ গবেষণার নামে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কী? যাঁরা নির্ভেজাল বিজ্ঞানপন্থী, তাঁরা বলবেন, কেন বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে, ভারত মহাকাশবিজ্ঞানে গুটিকয় উন্নত দেশের সঙ্গে একাসনে বসার সম্মান লাভ করছে, এ তো দেশের পক্ষে মহা গর্বের ব্যাপার। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার কী আছে! বেশ, তবে সেই প্রশ্ন ছেড়ে অন্ধ্রের যে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে 'মঙ্গলযান' নামক মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, সেখানে চলুন। মঙ্গলযানটি রওনা হয় ৫ নভেম্বর ১৪.৩৮ ঘটিকায়। সারা দিনে এত সময় থাকতে ওই রকম ভগ্নাংশের সময়ে কেন? কারণ আছে। দেশটার নাম ভারত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নামে তো ঐতিহ্য-সংস্কার জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। ওই সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে ত্রিদোষ এড়াতে। সেই ত্রিদোষের নাম— রাহু কালম, গুলিকা কালম ও যমকাণ্ডকা কালম। কেরলের এক বাঘা জ্যোতিষী সেই দোষ ঠেকাতেই শুভ দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়েছিলেন। যদি ফাঁকফোকর দিয়ে কোনো বিপদ চলে আসে, তাই ঝুঁকি না নিয়ে আমাদের গর্বের বিজ্ঞানী ইসরো-প্রধান কে রাধাকৃষ্ণন ত্রিচুড়ের বিখ্যাত মন্দিরে গিয়ে মানত করে এসেছেন। তিরুপতিতে ভগবান বেঙ্কটেশের পুজো না দিয়ে রাধাকৃষ্ণন ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা এমন শুভ কাজে হাতই দেন না। যদি ভগবান বেঙ্কটেশ কর্তব্যে অবহেলা করে ফেলেন, তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাঁরা গিয়েছিলেন কাছেই কালাহস্তি মন্দিরে ও সালারপেটের অঙ্কম্মল মন্দিরেও। এরপর সমস্বরে সাধু সাধু বলা ছাড়া উপায় থাকে কি!

আর একটু তথ্য জানাই, সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে একটি মিডিয়া সেন্টার তৈরি করা হয়েছে প্রচারমাধ্যমকে বিজ্ঞানের জয়রথ এগিয়ে যাওয়ার খবর দেওয়ার জন্য। সেটা করা হয়েছে বাস্তুশাস্ত্র মেনে।

আরেক সাধু-উদ্‌যোগের কথাও প্রসঙ্গত বলা দরকার। সেই সাধুর নাম শোভন সরকার। সাধুজি স্বপ্ন দেখেছিলেন উন্নাওয়ে রাজারাও রামবক্সের দুর্গের নীচে এক-দু ভরি নয়, হাজার টন সোনা পোঁতা রয়েছে। সাধুর এই শোভন স্বপ্নে মাতোয়ারা গোটা দেশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চরণদাস মহান্তও। যার ফলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার মতো দুই কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ছুটে যায় সোনা উদ্ধারে। অনেক নাটক, উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে শেষমেশ সোনা পাওয়া যায় নি, যাওয়ার কথাও নয়। যদি ঘটনাক্রমে ওখানে এক রতিও সোনা মিলত, তাহলে কী হত, ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়।

এতো গেল দেশ ও দশের কথা। দেশ এগিয়ে চলুক, ততক্ষণে নিজেদের কথায় আসা যাক। গত কয়েক বছর ধরে প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে। এবারও হয়েছিল। দারুণ সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সেই দিনই প্রকাশিত হয়েছে উৎস মানুষ পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু লেখা সহ অন্যত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অশোকের লেখা, চিঠিপত্র ইত্যাদির এক সঙ্কলন 'লেখালিখি'। প্রতিবারের মতো এবারেও বইমেলায় থাকছি আমরা। স্টল নম্বর ১৭৫। পাঠকবন্ধুদের সঙ্গে ওখানে দেখা হবে। মেলায় আরো দুটি বই প্রকাশের চেষ্টা চলছে। একটি 'যুক্তিবাদের চার সেনাপতি'--- জ্যোতিরাও ফুলে, গোপালগণেশ আগরকর, রুচিরাম সাহনি ও নরেন্দ্র দাভোলকারকে নিয়ে ও অন্যটি 'মূল্যবোধ', বিষয় মূল্যবোধই।

সম্প্রতি কলেজ স্কোয়্যারে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর ধরে এতেও অংশ নিচ্ছে উৎস মানুষ। এবারেও নিয়েছে। নানাভাবে পাঠকের উৎসাহ আমাদের প্রাণিত করেছে।

কলেজ স্কোয়্যারে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন মেলায় উৎস মানুষের স্টলে বিকিকিনি।

আহরণ

সরস্বতী গোরা
শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

চন্দনা মিত্র

সরস্বতী গোরার জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গত ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়বাড়া গিয়েছিলাম। আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় লবণম্, যাঁর সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তাঁর নিজস্ব চিকিৎসার সূত্রে আমাদের পরিচয় গাঢ়তর হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা নাস্তিকতা কেন্দ্র, লবণম্ যার অন্যতম সংগঠক।

নাস্তিকতা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং তাঁর স্বামী গোরা। তাঁদের নয়টি সন্তান, তাঁদের সন্তানসন্ততি এবং তাঁদের সন্তানাদি--- পাঁচটি প্রজন্মের সকলে এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। বিজয়বাড়া শহরের অন্যতম ব্যস্ত কেন্দ্রে এক সমর্থকের দান করা জমিতে নাস্তিকতা কেন্দ্রে বিশ্বের প্রথম নাস্তিকতা গবেষণা কেন্দ্র, হাসপাতাল, কর্মরতা মেয়েদের আবাসন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। সরস্বতী গোরার নয়জন পুত্র কন্যার আট জনই এই কেন্দ্রে একটি-দুটি ঘর নিয়ে বসবাস করেন, তাঁরা একই রান্নাঘরে খাবার খান এবং এই কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলিকে পরিচালনা করেন সংগঠক এবং কর্মী হিসাবে। সরস্বতী গোরা আর গোরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার আন্দোলন, দেশগঠন, নাস্তিকতার সংগ্রাম তথা ধর্মীয় ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে একই আদর্শে নিজেদের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করেছেন, সন্তান প্রতিপালন করেছেন, একই সঙ্গে।

কে এই সরস্বতী গোরা

সরস্বতী গোরা একজন সমাজবিপ্লবী, যিনি সারাজীবন ধরে লড়াই করেছেন অস্পৃশ্যতা এবং জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীমুক্তির সপক্ষে এবং নাস্তিকতা ও মানবতাবাদের প্রসারের লক্ষ্যে। এ লড়াই ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ। সরস্বতী গোরা আর তাঁর জীবনসঙ্গী গোরা একসঙ্গে ভারতবর্ষে নাস্তিকতাবাদী অভিযানের সূচনা করেন। ১৯৭৫ সালে গোরার মৃত্যুর পর সরস্বতী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে নাস্তিকতা কেন্দ্রকে চালিয়ে নিয়ে যান। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানবতা ও নাস্তিকতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-জাতপাত-দেশ নিরপেক্ষ সমাজসেবার কাজকে প্রসারিত ও বিকশিত করা। তিনি বলতেন, 'ভালো কাজ করো, ভাল মানুষ দাও, ঈশ্বর মানা আর তার নামে পূজোপাঠ করা আবশ্যকীয় নয়'। একজন অদম্য আশাবাদী কর্মীর ভূমিকা নিয়ে তিনি পাঁচ দশক ধরে নাস্তিকতা কেন্দ্রটির এক বিশাল উত্তরণ ঘটাতে পেরেছিলেন। সরস্বতী গোরা স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের পুনর্গঠন এবং জাতিগঠনে এক সেতুর ভূমিকা পালন করে গেছেন।

জন্ম ও বাল্যজীবন

সরস্বতী গোরার জন্ম ১৯১২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর, অন্ধ্রপ্রদেশের এক মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে। পোদুর লক্ষ্মী নরসিংহম্ এবং কোণ্ডাম্মার তিনি ছিলেন অষ্টম সন্তান। সচ্ছল পরিবারে সরস্বতী একটি হাসিখুশী মেয়ে হয়েই বড় হচ্ছিলেন সব ধরনের রক্ষণশীল সংস্কার আর আচারবিচারের মধ্যে দিয়েই। সেই নিয়মেই দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় তাঁর বাবার বন্ধু গোপারাজু ভেঙ্কটসুব্বা রাওয়ের দ্বিতীয় পুত্র গোপারাজু

রামচন্দ্র রাও বা গোরার সঙ্গে। তবে সরস্বতী ছোট থেকেই ছিলেন প্রতিবাদী মনোভাবের।

স্বামীকে দেখে প্রেরণা পেলেন

গোরার সঙ্গে যখন থেকে তাঁর বিবাহিত জীবন শুরু হল, তিনি দেখলেন তাঁর জীবনসঙ্গী সেই সময়কার বহুবিধ সামাজিক বৈষম্যের তীব্র বিরোধী, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। প্রায় সব বৈষম্যের শিকড় ছিল ধর্মের মধ্যে লুকিয়ে— তাই গোরা 'ঈশ্বর আর ধর্মবিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই' এই কথা বলে তখনই লড়াই শুরু করে দেন। সেই লড়াই সরস্বতীকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়ে।

গোরার সঙ্গে বিবাহ প্রতিবাদী মনের সরস্বতীর জীবনে একটা মোড় হিসাবে এবং তাঁকে ঘরের গণ্ডী ভেঙ্গে এক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যময় জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল, যে কঠিন সমস্যাবলী ভারতবর্ষকে গ্রাস করে রেখেছে, সেই দিকে তাঁর মনকে আকৃষ্ট করল। গোরার মত সমমনস্ক বিপ্লবী মানুষের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর পাশাপাশি পুরোনো দিনের একজন নারী হিসেবে তাঁর যে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাও তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছিল। তিনি সমস্ত সোনার গহনা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছিলেন, খাদি পরতেন এবং সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সরস্বতী গোরা

সরস্বতী এবং গোরা দু'জনেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সত্যগ্রহ আন্দোলনে সরস্বতী সবার সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শান্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। সরস্বতী স্বাধীনতা সংগ্রামী, গান্ধীবাদী সমাজসংস্কারক, বিশ্বের শান্তি আন্দোলনের কর্মী এবং সমাজকর্মীদের সঙ্গে একযোগে এমন একটি সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন যার ভিত্তি হবে ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা।

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তরুণ বিপ্লবী দুর্গাবাঈ দেশমুখ ছিলেন তাঁর প্রেরণা। অহিংস পথে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলন, মিছিল করতে গিয়ে তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী সরস্বতী গান্ধীজী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধ, স্বেচ্ছাব্রতীর উদ্যম এবং সমাজ পুনর্গঠনের ভাবনার ভিত্তিতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারত গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

সরস্বতী সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক কাজের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। সেক্ষেত্রে জাঁকজমকহীন এবং পার্টিবিহীন গণতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল। শুধু ভাষণ না দিয়ে বা নেতিবাচক কথা না বলে তিনি যৌথ উদ্যোগে মানুষের কল্যাণের জন্য বাস্তব এবং ইতিবাচক কাজ করাকেই রাজনীতির সঠিক রাস্তা বলে মনে করতেন। ১৯৬১-৬২ সালে 'মন্ত্রীরা জনগণের আজ্ঞাবহ এবং জনগণই তাদের আজ্ঞাদানকারী' এই শ্লোগান নিয়ে ১০০ দিন ধরে গোরা দম্পতি সেবাগ্রাম থেকে দিল্লী ১১০০ মাইল পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। 'ভূদান অভিযানে' সরস্বতী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ধর্ম, জাতপাত বা প্রথাগত কারণে যারা সামাজিক-রাজনৈতিক বঞ্চনার সব থেকে বেশি শিকার হয় সেই দলিত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করার কাজে গোরা দম্পতি এবং পরে সরস্বতী নিজে যুক্ত থেকে লাগাতার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছেন। তাঁরা যেখানে গেছেন, সবসময় হরিজন বস্তিতে বসবাস করেছেন।

১৯৪০ সালে গোরা দম্পতি অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা জেলার মুদুনুরু গ্রামের মানুষদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং পৃথিবীর প্রথম নাস্তিকতা কেন্দ্র স্থাপন করেন। সরস্বতী সেখানকার প্রতিটি বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে অধিবাসীদের, বিশেষ করে বড় ও বয়স্ক মেয়েদের পড়াশোনা শেখায় উৎসাহিত করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। জাতপাত ও লিঙ্গগত হীনমন্যতা দূর করতে তিনি তাদের জাতিগত মর্যাদা এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতেন। কুসংস্কারের গণ্ডি ভাঙ্গার লক্ষ্যে এদের নিয়ে গ্রামে সকলের সঙ্গে পংক্তিভোজন, ভিন্ন জাতের মধ্যে, ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিয়ে ঘটিয়েছেন। রক্ষণশীল সমাজের বাধার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ও গোরা এই সমস্ত কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে করে গেছেন। তাঁদের সন্তানাদিও একই সঙ্গে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে।

সরস্বতী ও গোরা মনেপ্রাণে সমস্ত কাজে প্রচণ্ড গণতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁরা মুখে যা প্রচার করতেন নিজেদের জীবনে ও কাজে তাই-ই করতেন। যে কোন বিষয় খোলাখুলি উপস্থাপন করে, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষদের মনে তার পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতেন। যেমন, প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ভাঙতে সেই মানুষদের মনে সাহস যোগানোর একটা উপায় হিসেবে সরস্বতী নিজে তাঁর প্রথম গর্ভাবস্থায় সূর্যগ্রহণ দেখলেন। পরে যখন তাঁর সুস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল তখন সেইসব মানুষও তাঁদের যুক্তিপ্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখতে শুরু করলেন।

এইভাবে গোরা দম্পতি অন্ধ্রের জঘন্য দেবদাসী প্রথাকে ভাঙতে কঠিন লড়াই করেছেন, যা পরে সরস্বতী, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লবণম্ এবং পুত্রবধূ হেমলতা মিলে জারি রেখেছিলেন। দেবদাসী বা যুগিনীরা ছিল দেবতার নামে পুরোহিত এবং গোটা সমাজের জবরদস্তি ভোগের বস্তু। সুবিধাভোগীরা রটিয়েছিল

দেবদাসীদের বিয়ে হতে নেই— আর এটাই ছিল প্রচলিত ধারণা। সরস্বতী ও গোরা দেবদাসীর বিয়ে সংঘটিত করে ধারণা ভাঙতে পদক্ষেপ রাখেন। পানীয় জলের কুয়ো খনন করিয়ে ঐ গ্রামে অস্পৃশ্য বলে যাদের একই কুয়ো থেকে জল নিতে দেওয়া হত না তাদের সহ সকল জনসাধারণের জন্য তাঁরা তা উন্মুক্ত করে দেন। অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তাঁদের এই লড়াই গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'হরিজন' পত্রিকায় গোরা দম্পতির কার্যকলাপের কথা লেখা হয়। গান্ধীজীর আমন্ত্রণে তাঁরা সেবাগ্রাম আশ্রমে আসেন সপরিবারে।

অহিংসা ছিল তাঁদের কাজের প্রধান শর্ত। এই কারণে তাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দৃঢ় ও সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসবশত গান্ধীজী যে বলতেন— 'ঈশ্বরই সত্য' (God is truth), ১৯৪৪ সালে সেবাগ্রামে গোরার সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর অনেক দফায় আলোচনা হয় এবং গান্ধী বাক্যটি 'সত্যই ঈশ্বর' (Truth is God)-এ বদল করে নেন। তাঁরা গান্ধীজীকে বলেন যে তিনি ঈশ্বরকে মানেন, তাঁর নামে রামধুন গান করেন, কিন্তু ঈশ্বরের মন্দিরে তো সমাজ হরিজনদের প্রবেশ করতে দেয় না। তাই তাঁরা সেবাগ্রাম ছেড়ে চলে আসেন। সরস্বতীদের নাস্তিকতা ছিল মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করার সাংস্কৃতিক-সামাজিক হাতিয়ার।

সরস্বতী তাঁর সন্তানদের জাত-ধর্ম নিরপেক্ষভাবে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেন। সরস্বতীর পরিবারের পরবর্তী সবকটি প্রজন্ম এই আদর্শ অনুসরণ করে চলে। সরস্বতী বিয়ের সরকারি নথিভুক্তি (রেজিস্ট্রেশন) 'বিশেষ বিবাহ আইন' যা ভারতবর্ষে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, সেই অনুসারে করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করতেন। তিনি ও গোরা সন্তানদের এবং যেখানে যে কাজে যেতেন সেখানকার সমস্ত মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে ও প্রশ্ন না করে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে জানার জন্য প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতেন। তাঁদের নাস্তিকতা ছিল ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং সৃষ্টিশীল।

গোরার মৃত্যুর পর সরস্বতী নাস্তিকতা কেন্দ্রের সমস্ত কাজে নেতৃত্ব দিয়ে তার প্রসার এবং বিকাশ ঘটান, যার মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার থেকে মুক্তির পাশাপাশি সমাজের দুর্বল, অবহেলিত অংশকে শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা, আর্থিক স্বনির্ভরতা, অপসংস্কৃতি ও অপরাধমূলক কাজ থেকে সৎ ও আত্মনির্ভর জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং কম খরচে চিকিৎসা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর-স্বাস্থ্য-অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে কুসংস্কার দূর করা ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজের জন্য সরস্বতী বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৬ সালের ৯ই আগস্ট, ৯৪ বছর বয়সে সরস্বতী প্রাণত্যাগ করেন। সমস্ত স্তরের হাজার হাজার মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

সরস্বতী গোরার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণসভায় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, তাঁর বিশাল পরিবারের সদস্যরা এবং নাস্তিকতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলির কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বহুজন বক্তব্য রাখেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে সরস্বতীর তেজস্বিতা, দূরদর্শিতা, সত্যনিষ্ঠা ও অসাধারণ কর্মক্ষমতা, মুক্ত উদার মন এবং মানুষের প্রতি অপার ভালবাসার অনেক পরিচয় পাই। মৈত্রী, তাঁর প্রথম মেয়ের মুখে শোনা একটি ঘটনায় তার প্রতিফলন ঘটে— একদিন এক গর্ভবতী মহিলা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে নাস্তিকতা কেন্দ্রে সরস্বতীর কাছে এসে পড়েন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু এখানে কোন বাছবিচার নেই, তাই তিনি খেতে চান না। অনেক পরে তিনি বলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, অন্য বর্ণের রান্না করা খাবার খান না। তখন সরস্বতী তাঁর রান্নার আলাদা ব্যবস্থা করে দেন। এতে কেন্দ্রের কর্মীরা মহিলাটির ওপর বিরক্ত হন। তাঁরা আরও আশ্চর্য হন যে, সরস্বতী তাঁকে তো কিছু বললেনই না, উপরন্তু তার কথামত বর্ণভেদ মেনেই ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁরা সরস্বতীর কাছে অনুযোগ করলেন যে এতে কেন্দ্রের নীতি থেকে সরে আসা হল না কি? সরস্বতী তাঁদের বুঝিয়ে বললেন যে, নাস্তিকতার আদর্শ তো আসলে মানুষকে বৈষম্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া, যে মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে তাকে তার থেকে মুক্ত করাই হল প্রথম কাজ, তাছাড়া নাস্তিকতার আদর্শ জোর করে কারোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তাকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণও করা যায় না। মহিলাটি এই সাহায্য পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন এবং ক্রমে ক্রমে তিনি এই কেন্দ্রের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

সরস্বতী গোরার মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সন্তানেরা পশ্চাদপদ, বঞ্চিত, অবহেলিত জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সচেতনতা ও স্বনির্ভরতামূলক প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। তবে এর জন্য আজও তাঁদের বিদেশী আর্থিক সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এটা কাম্য নয়। আমরা মনে করি সরস্বতী গোরার মুক্ত মানবিকতার আদর্শ ও সক্রিয়তাকে ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে দেশের সচেতন মানুষেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক, আর এভাবেই সফল করে তুলি তাঁর স্বপ্নকে।

অহল্যা

উনত্রিংশ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা। শহীদ দিবস সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১২।

সৌজন্য: নিরঞ্জন বিশ্বাস

উমা

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য— আমরা কী ভাবছি?

ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়

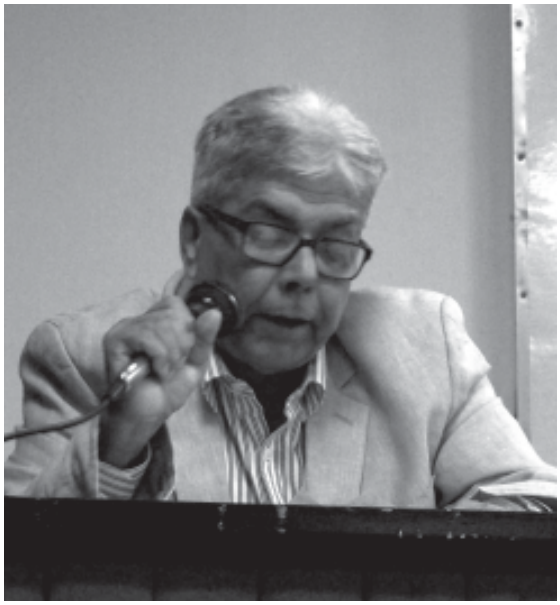

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আহ্বান জানানোর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কিঞ্চিৎ আশঙ্কার কথা প্রকাশ না করে পারছি না। আগে যাঁরা এই বক্তৃতা মালায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। আমি সে রকম কোনো দাবি করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যখন আমাকে আমন্ত্রণ করা হল, আমার সীমিত জ্ঞানের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত কিছু কিছু বক্তব্য আপনাদের সঙ্গে ভাগ করতে চাই। কিছু কিছু ব্যক্তি থাকেন যাঁদের নিষ্ঠা ও কর্মকাণ্ড তাঁদের তৈরি গোষ্ঠী, সংগঠনের বা নির্মাণের সঙ্গে সমার্থক হয়ে পড়ে। প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎস মানুষ-ও ঠিক একই রকম। ১৯৮০-র দশক থেকে উৎস মানুষ-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ৭০-এর দশক কাটিয়ে কিছুটা হতাশা মেশানো শ্মশানের শান্তির পরিবেশে যে কটি গোষ্ঠী মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার জন্য ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে উৎস মানুষ তাদের মধ্যে নিয়মিত ও অগ্রগণ্য। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাঁর কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে উৎস মানুষ সম্পূর্ণ সফল। এই রকমই এক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যুক্তিবাদী পত্রিকা ড্রাগ ডিজিজ অ্যান্ড ডক্টর-এর সম্পাদনার কাজে আমি কিছুদিন যুক্ত থেকে বলতে পারি আমি সে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি ও এ ব্যাপারে আমার অপদার্থতা স্বীকার করতে কোনো কুণ্ঠা নেই। আমার আজকের বক্তব্যের মাধ্যমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যে যে ব্যবহারিক পরিবর্তন ঘটেছে তা জানাতে চাই। তাই এর শিরোনাম "চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য — আমরা কী ভাবছি"?

প্রথমেই বলে রাখা ভাল সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন সকলেরই। আপনি প্রতিক্রিয়াশীল হোন বা বিপ্লবী হোন, দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী— যাই হোন না কেন শরীরটাকে ঠিক না রাখলে কিন্তু কোনো কিছুই ঠিকঠাক চলে না। এ ব্যাপারে সবসময় যে অজ্ঞতা দায়ী তা কিন্তু নয়। এক ধরনের অদ্ভুত উদাসীনতাও আমাদের মধ্যে কাজ করে ও আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয়। এবং এর সঙ্গে বিত্তেরও কোনো নিশ্চিত সম্পর্ক আছে তাও কিন্তু নয়। এইজন্যই আমাদের শরীরটাকে জানতে হবে। জানতে হবে— স্বাস্থ্য আর চিকিৎসার মধ্যে তফাত। যদিও, এই দুটি শব্দকে আমরা অনেক সময়ই সমার্থে বা পারস্পরিক পরিবর্তনীয় হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। এই বিষয়ক যে কোনো আলোচনা বা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এদের পৃথকীকরণ প্রয়োজন। রোগ বা অসুখে ভুগলে তার চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু স্বাস্থ্যের ধারণা আরও বিস্তৃত। স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাদ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানীয় জল, দূষণমুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, নিয়মিত রোজগার ইত্যাদি এবং অবশ্যই সঠিক গুণমান সম্পন্ন ও ঠিক সময়ে চিকিৎসার ওপর। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এই দুয়েরই আবার ব্যক্তিগত ও জনগোষ্ঠীগত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। চিকিৎসা বলতে যা কিছু ব্যবস্থা, যা রোগ সারায় তা বোঝালেও আজকের অলোচনার বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাই বোঝাবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বললেই সরকার থেকে— রাজনৈতিক নেতাদের মনে আসে ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, হাসপাতাল, অপারেশন থিয়েটার, যা কিনা আসলে চিকিৎসা পরিষেবার অঙ্গ। কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া নীরোগ মানুষকে, রোগীকে নয়। চিকিৎসার প্রয়োজন রোগাক্রান্তের— নীরোগ মানুষের নয়।

আসলে চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে খোলা মনে কোনো রকম পক্ষপাত ছাড়া কথাবার্তা বলা মুস্কিল হয়ে যায়। অসুস্থ মানুষ আমাদের কাছে একটি প্রতীক বিশেষ। সে মারা যায় নি, জীবনের সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে, সুতরাং তাকে চিকিৎসা দিয়ে

নিরাময় করে তুলতে হবে। যে কারণের জন্য সে অসুস্থ হল— শারীরিক সামাজিক পরিবেশগত বা রাজনৈতিক সে সব কারণ অনুসন্ধান করতে আমাদের ইচ্ছে বা উৎসাহ খুব একটা থাকে না। একটাই চিন্তা তখন ঘুরপাক খেতে থাকে, একে চিকিৎসা পেতে হবে। আহা-হা ও খেতে না পাক চিকিৎসাটুকু পাক। আহা-হা বিষ মেশানো বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় নিক— চিকিৎসাটুকু পাক। আসলে সেই মুহূর্তে এক রোগাক্রান্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতাশায় ভরা মুখ আমাদের অসহায় করে তোলে। আমাদের মনে হয়, ও চিকিৎসাটুকু পাবে না? যে কোনো মূল্যেই পেতে হবে। তখনই মনে হয় এটা ওর অধিকার। এইভাবেই আমাদের চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এই অসুস্থ মানুষ। চিকিৎসা দেওয়ার তাড়নায় আমরা অসুস্থতার উৎস সন্ধানে গিয়ে তার মূল উৎপাটনে অতটা মনোযোগ দিই না। সেখানেই আসে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার কথা। এ সম্বন্ধে আলোচনায় আরেকটি জরুরি ব্যাপার আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ। তাই দিয়েই আমরা সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দেখার চেষ্টা করি। আমরা যদি এক শ্রেণী প্রতিনিধি হয়ে একই সঙ্গে শহুরে ও গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসাব্যবস্থা আলোচনা করতে চাই, তাহলে সমস্যা হবেই। সমস্যা সমাধানের উপায় ভাবা সদর্থক হতে পারে। আবার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নেবার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে অনেক উৎসাহী মহল।

চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেকেই ভাবেন যে, আধুনিক কালেই একে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তা কিন্তু নয়। চিরকালই চিকিৎসা পণ্য ছিল। একদম পুরাকালে এক সামাজিক শ্রেণী ছিল, যারা এই ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। আসলে একটি অতি আবশ্যকীয় পণ্যকে নিয়ে যখন অনৈতিক ব্যবসা শুরু হয় তখনই দেখা দেয় বিপদ। চিকিৎসা পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতো শুধুমাত্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে এক বাধ্যবাধকতা কাজ করে। ক্রয়ক্ষমতা না থাকলেও ঘটিবাটি ঘরবাড়ি বেচেও কেনে বা কিনতে বাধ্য হয়। আবার এই পণ্যের এক অনন্য ব্যাপার হচ্ছে এর মূল্য নির্দ্ধারণ করে বিক্রেতা তার খুশি মতো। এই পণ্যের বিক্রির জন্যে এক মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। তার নাম চিকিৎসক বা ডাক্তার। কোনো অপারেশনে চার্জ হল ৫ হাজার, একই অপারেশনে অন্য জায়গায় ৫০ হাজার। একই ওষুধ এক কোম্পানির ৫০ পয়সা তো অন্য কোম্পানির ৫ টাকা। ডাক্তারবাবুর পরামর্শেই কিনতে হয়। কিছুটা চাহিদা যোগানের ওপর নির্ভর হয়তো করে এই মূল্য। কিন্তু এই চাহিদাকে কৃত্রিম ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন উপায়ে।

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকু সব মানুষের কাছে এবং একইরকমভাবে সর্বজনীন বণ্টন ও সমবণ্টন কীভাবে সম্ভব? একমাত্র রাষ্ট্রই পারে এই ব্যবস্থা করতে। এই ব্যবস্থার প্রথম সফল প্রয়োগ দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা পরিষেবা যতটুকু লভ্য ছিল, সর্বজনীন বণ্টন করা হল। প্রাচুর্যের না হলেও অনটনের সমবণ্টন। এর ফলেই সে সব দেশে জনস্বাস্থ্যেরও চোখ ধাঁধানো উন্নতি দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জনগণও এই রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর জন্য ক্রমাগত চাপ দেয় ও আন্দোলন করে যায়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ভারতের মতো সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন যুক্ত দেশগুলিও নিজেদের কল্যাণ রাষ্ট্ররূপে দাবি করে, জনগণের জন্য মোটামুটি এক সর্বজনীন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এসব ৫০ থেকে ৭০ দশকের কথা। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রাম-আধা শহর থেকে বড় শহরে বিস্তৃত ছিল। এখন গল্প মনে হতে পারে, ৭০-এর দশক পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসার ওপর নির্ভর করত সর্ব বিত্তের মানুষজন। এই সময় থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে ঘটতে থাকে কিছু চমকপ্রদ প্রযুক্তিগত আবিষ্কার। মূলত বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এইসব আবিষ্কার বিশাল খরচ সাপেক্ষে মানুষের জীবনে অনেক কঠিন অসুখেও সুখানুভূতির ছোঁয়া দিতে লাগল। সরকারি চিকিৎসার চাহিদা বাড়ছে কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে খরচও হচ্ছে অনেক। অচিরেই দেখা গেল আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় কম। চিকিৎসার অনটন রাজনৈতিক সঙ্কটেরও অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে এল ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মাধ্যমে সেই বিখ্যাত আলমা আটা ঘোষণা। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য। ভারত সরকার লুফে নিল এই কর্মসূচি। এতে মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা জোর দিয়ে বলা হল। চিকিৎসা পরিষেবার কথাটা দায়সারাভাবে বলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পশ্চিমি অ্যালোপ্যাথি বহির্ভূত অন্যান্য পদ্ধতির চিকিৎসা পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হল। আসল কথা হল সরকারি চিকিৎসাখাতে ব্যয় কমানো। এই সময় অর্থাৎ ৮০-র দশকের শেষ ভাগ থেকেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় আকারে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকল সরকারি উৎসাহে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তুলে দেওয়া হতে থাকল বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে। এর নাম হল প্রাইভেট-পাবলিক-পার্টনারশিপ এবং এর পক্ষে নতুন নতুন যুক্তি খাড়া করা হতে থাকল। সরকারি হাসপাতালগুলোতেও আধুনিকীকরণের নামে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের রূপ দিয়ে অনাবশ্যক খরচ করে রুগীদের কাছ থেকে চিকিৎসার জন্য মূল্য নেওয়া হতে থাকল। এ ব্যাপারে কোনো সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকার দরুন ভারতের কোনো সংসদের রাজনৈতিক দলই এ ব্যাপারে আপত্তি করে নি। জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকল আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সেটা নেহাতই বিক্ষিপ্তভাবে। জনগণ এ কথা বোঝে যে স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেক উপাদানই তারা নিজ উদ্যোগে জোগাড় করে নিতে সক্ষম। কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়

না। এই কাজটা জনগণের নাগালের বাইরে, সামর্থের বাইরে। তাই রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্রমাগত চিকিৎসা পরিষেবার দাবি তুলে জনগণ মোটেই ভুল করে না, ঠিকই করে।

মুস্কিল হচ্ছে যাঁরা এই ব্যাপারগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাঁরাও এই একটা ব্যাপার অর্থাৎ 'সরকারকেই জনগণের দায়িত্ব নিতে হবে ও সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে ব্যবহারিক দিক থেকে উৎকর্ষতার তুঙ্গে নিয়ে যেতে হবে'— এই একটি দাবি নিয়ে কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে পারি নি। অনেকেই নিজের মতো করে মানুষের দুঃখ দুর্দশা কিছুটা হলেও নিবারণের জন্য কম খরচে গুণমানসম্পন্ন চিকিৎসা দেওয়ার কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। কেউ গ্রামীণ স্বশিক্ষিত চিকিৎসকদের বা আগ্রহী জনসাধারণকে কিছুটা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার একটা কাজ চলা গোছের পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। আবার কেউ কেউ এদের যাতে সরকার স্বীকৃতি দেয় তার জন্যও আন্দোলনের পরিকল্পনা করছেন। শহরে থাকা প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরাও এই আন্দোলনের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে এগুলো কিছুটা অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কিছু দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাজেও আসতে পারে। কিছুটা প্রমাণ করে দেখিয়ে উদাহরণ হিসেবেও খাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু এই ১২১ কোটির দেশে যেখানে ৬০ কোটিরই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা কেনার কোনো ক্ষমতা নেই, রাষ্ট্র বা সরকার যদি তাদের চিকিৎসা না দেয় তারা কোথায় যাবে? মূল লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্রকে চিকিৎসা দিতে বাধ্য করার জটিল আন্দোলনে না গিয়ে গ্রামীণ বা গরিব রোগক্লিষ্ট জনসাধারণের জন্য কিছু না করতে পারার বা নিজের শহরে যাই হোক এক চোখ ধাঁধানো আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা বলয়ে থেকে এক ধরনের অপরাধ বোধ ও হতাশার মানসিকতা থেকে আমরা এই কাজগুলো করে থাকি কি না ভেবে দেখতে পারেন সকলে।

প্রযুক্তি বা টেকনোলজি একটি সমস্যা বিশেষ। কেন না একে ছাড়া আমাদের চলে না। এবং এর ব্যবহার আমাদের ভাল করে, কখনও খারাপও করে। মানুষ অন্য সব কিছুর সঙ্গেই এক প্রযুক্তি পাগল বা যন্ত্র তৈরির প্রাণী বিশেষ। আমরা মস্তিষ্ক ও স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে পরিবর্তন করতে চাই— আর তা করতে গিয়ে পরিবর্তন করে ফেলি নিজেকে। এছাড়া আমাদের একটা ক্ষমতা আছে অসুখী করার এবং তাতে আবার একটা গর্ব অনুভব করার। প্রযুক্তিগত সাফল্যে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু এর বোঝাকে বইতে চাই না, তার থেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। সেইজন্যই ঠিক করে উঠতে পারি না কোন প্রযুক্তি কতটা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে প্রযুক্তি হচ্ছে প্রকৃতির ওপর মানুষের ইচ্ছাশক্তি কায়েম করা। এই নিয়ন্ত্রণ করার যে ক্ষমতা সেটা আমরা ছাড়তেও পারি না। কেননা প্রযুক্তিগত জ্ঞান একবার অর্জন করে তাকে আর আমরা হারাতে পারি না। কিছুদিন আগেও প্রযুক্তির এতটা রমরমা যখন ছিল না তখন চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় রোগী ও রোগ পর্যবেক্ষণ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যার পোশাকি নাম ছিল ক্লিনিক্যাল মেডিসিন। আস্তে আস্তে সেই শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমে অবলুপ্তির পথে। ফলে প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়বেই।

সমস্যা হচ্ছে এমন এক একটা প্রযুক্তিকে নিয়ে, যা আমাদের জীবনে তাৎক্ষণিক আরাম দেবে। কিন্তু তার জন্য অর্থমূল্য দিতে হবে অনেক। হয়তো সেই শারীরিক আরামটুকু পেলাম, কিন্তু তাকে পেতে গিয়ে আমি বা আমার পরিবার এক আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লাম। বিজ্ঞানীরা যতই চেষ্টা করে কম খরচের প্রযুক্তি বার করুক স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা এবং এর মধ্যে এক ধরনের চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্মীরাও আছেন, তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ওই খরচসাপেক্ষ বা বেশি লাভজনক প্রযুক্তির দিকেই ঠেলে দেবে। এই সব কিছুর জন্য ডাক্তারদের মগজধোলাই দেওয়ার জন্য যা যা দরকার মিটিং, সেমিনার, জার্নাল-এ পেপার করবে। 'কেস' পাঠালে কমিশনও দেবে। আর এ ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই বিশদ জ্ঞান না থাকা মানুষও তাকেই নিতে চাইবে ঘটিবাটি বিক্রি করেও। এর আরেকটা দিক হচ্ছে প্রযুক্তির অপব্যবহার। উদাহরণ দিই। তুলনায় অনেক কম খরচের এক্স-রে বা ইউ এস জি-র নিয়মিত বা ঠিকঠাক ব্যবহার না করে অনেক খরচ সাপেক্ষের সি টি স্ক্যান বা এম আর আই-এর জন্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রাইভেট কোম্পানির দরজা খুলে দেওয়া হল ওই পি পি পি মডেলে। ব্যক্তিমালিকানা তার উপভোক্তার স্রোত নিশ্চিত করার জন্য এই জায়গাই পছন্দ করবে। আর চিকিৎসকরাও অপ্রয়োজনীয় হলেও এই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাইবে। গরিব মানুষ উন্নত চিকিৎসার নামে আরও গরিব হবে। প্রযুক্তির ব্যাপারে আরেকটা উদাহরণ দিই। অনেক সময়ই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হই গত ৪০ বছরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর পাই, রঞ্জন বা রেডিওলজি বিভাগের যে সব অত্যাশ্চর্য রোগ নির্ণয়কারী যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে বা ক্যান্সারের ওষুধের কথা। কেউ ভেবে দেখে না ও আর এস-এর কথা। ৭০-এর দশকে যখন বিজ্ঞানীরা দেখালেন নুনজলের সঙ্গে চিনি মেশালে অন্ত্রে লবণ ও শোষিত হয় অনেক বেশি। আবিষ্কার হল ও আর এস, বেঁচে গেল লক্ষ লক্ষ আন্ত্রিকে আক্রান্ত মানুষ গ্রামেগঞ্জে যৎসামান্য খরচে। এই ধরনের কম খরচের প্রযুক্তির ব্যবহার বহু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দিনের পর দিন চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের সেই সব কাজ বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে। এদেশে সরকার ডাক্তারদের সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ মাধ্যমে হয়তো কখনো সখনো সম্মান জানানোর জন্য এদের ব্যক্তিগতভাবে পিঠ চাপড়ানো হয়েছে, কিন্তু এই কাজগুলি কি করে বাস্তবে ব্যবহৃত হবে তার সুরাহা হয় নি।

ওআরএসটি-ও প্রযুক্তি। অথচ এটা ব্যবহার না করে বেসরকারি তারকাখচিত হাসপাতালে দেওয়া হবে শিরায় স্যালাইন দশগুণ খরচ বাড়িয়ে। এদের বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্য করেছেন? 'আজ রাতে বুকে ব্যথা!' বা 'আপনার পাল্‌স ঠিকঠাক চলছে তো গুনেছেন?' একই সঙ্গে ভয় প্রলোভন বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বদলে এক ইন্টারভেনশন-এর মধ্যে সব সময় থাকার যে হাতছানি তাকে আপনি জয় করবেন কী ভাবে?

নতুন নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে, লোভ দেখিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা এখন খুবই লাভজনক ব্যবসার রূপ নিয়েছে। তাই অন্যান্য ব্যবসায় মন্দার হাত থেকে বাঁচতে ব্যক্তিমালিকানা এখন এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী। আর ধুঁকতে থাকা রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যখন গণবিক্ষোভের রূপ নেওয়ার আশঙ্কা জাগায় তখন তার থেকে বাঁচতে সরকার এই বিনিয়োগগুলিকেই স্বাগত জানিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হিসেবে চিহ্নিত করে কৃতিত্ব দাবি করে। উন্নতির চিহ্নস্বরূপ হুঙ্কার ওঠে গ্রামেগঞ্জে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের। কিন্তু বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসা যে কৌশলে তার ব্যবসাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফন্দিফিকির নিত্য ব্যবহার করে চলেছে তা কিছু মানুষ বুঝতে পারলেও বেঁচে থাকার সহজাত উদগ্রীব ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে অনন্যোপায় হয়ে। এই বাজারি অর্থনীতির রমরমার যুগে কোনো ধরনের বাজারি কৌশলই আর এই ব্যবসায় অচ্ছুত নয়। রাস্তার ধারের বিরাট বিরাট হোর্ডিংগুলো লক্ষ্য করেছেন? সব ডাক্তারবাবুরা কেমন অপারেশন থিয়েটারের পোশাক পরে বুকের ওপর হাত জড়ো করে আছেন? যেন ভয় দেখাচ্ছেন কিছু হলেই অপারেশন থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেবো। এটাই নাকি কর্পোরেট সংস্কৃতি। এক শ্রেণীর চিকিৎসক ও হাসপাতাল গোষ্ঠী যে ধরনের লাগাম ছাড়া অর্থ উপায়ের মাধ্যমে নীতিবহির্ভূত কাজে নেমেছেন তাকে লুণ্ঠন বললে কমই বলা হবে। সীমাহীন লোভের সামনে অসহায় মানুষ কপর্দকশূন্য হয়ে যায়। এই এক পণ্য তৈরি হচ্ছে যেখানে ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস বা সর্বোচ্চ মূল্য বলে কিছু নেই। অপচিকিৎসায় মানুষ প্রাণে মরে আর লালসা ভরা চিকিৎসায় মানুষ মরে ধনে-প্রাণে। কে বাঁচাবে তাকে? কেন আন্দোলন করে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা যাবে না? আলুর দাম যদি নির্দ্ধারিত মূল্যে দিতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করা যায়, চিকিৎসা ব্যবসায়ীদেরই বা বাধ্য করা যাবে না কেন নির্দ্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে? আইন বা শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কথা ইচ্ছে করেই আজকের আলোচনায় আনলাম না। আসলে আমার বলার কথা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ে সরকার চিন্তিত, কারণ ভোটের রাজনীতি। কিন্তু মানুষের চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যের দাবি নিয়ে কোনো সংসদীয় রাজনৈতিক দলই সেভাবে আন্দোলন সংগঠিত করে না। এটা তাদের কর্মসূচিতে নেই। একটা দেশের মানুষ চিকিৎসা কী ভাবে পাবে, কতটা পাবে তার মূল চালিকা শক্তিই হল সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। মোটেই অর্থনৈতিক অবস্থান নয়। সব ধরনের মিডিয়া, পত্রপত্রিকা, সিনেমায় বড় বড় জটিল অসুখের চিকিৎসার কৃতিত্বের ছবি। শরীর বিচ্ছিন্ন মুণ্ড খালি জোড়া লাগানো হয় নি, কিন্তু আমি নিশ্চিত দু দিন পরে তা হবেই। প্রযুক্তির দৌড় কেউ ঠেকাতে পারবে না। সে না হয় হোক, বিত্তশালী মানুষজন আর পাঁচটা সুখের সঙ্গে এই শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তির সুখও কিনবে। কিন্তু কেউ হিসেব কষি না ওই সব অসুখ আমার দেশের মোট গুরুতর অসুস্থতার শতকরা কত ভাগ? উত্তর বিহারের কালাজ্বরে বা পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামের পর গ্রাম যে টি বি-তে উজাড় হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে হুজুর? সময় মত 'সিজার' না হওয়ার জন্য যে প্রায় ১ লক্ষ মা যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেলেন তার কী হবে? দূর মশাই, আমরা এখন পঞ্চম অর্থনৈতিক শক্তি চতুর্থ মিলিটারি শক্তি। সেই শক্তি কিন্তু গোসাবার অজয় নস্করের ২২ বছরের জোয়ান ছেলেটার সাপে কাটার থেকে মৃত্যু আটকাতে পারে নি। পারে নি বেলপাহাড়ির ২০ বছরের সোমবারি কিস্কুর একটোনিক প্রেগন্যান্সির থেকে মৃত্যুর। আমরা মজে আছি মেডিক্যাল ট্যুরিজম-এ। আমাদের জনসাধারণের টাকায় প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের দিয়ে রাজকীয় আদরে পাঁচতারা হাসপাতালে বিদেশীরা এসে উচ্চমানের দামি চিকিৎসা সে দেশের তুলনায় নামমাত্র মূল্যে করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন সাহেবি বহুজাতিক কোম্পানি এদেশে কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খোলে এদেশের সস্তা শ্রমশক্তির জন্য। তেমনই চিকিৎসা শ্রমিকের পরিষেবাও সস্তায় বিকোচ্ছে। যদিও বিক্রয় অর্জিত টাকায় জনগণের কোনো সুরাহা হচ্ছে না, সচ্ছল শ্রেণীর স্ফূর্তির খোরাক জোগাচ্ছে। আর আমাদের সরকার ওগুলোকেই দেখাচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হিসেবে এবং প্রচার মাধ্যমও তাকেই গৌরবান্বিত করছে। চিন্তার কথা হচ্ছে, যতই সরকার বা রাষ্ট্র এই জনচিকিৎসা থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, ব্যক্তিপুঁজি গ্রামাঞ্চলের দিকেও থাবা বাড়াচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলিকে ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। এখন তো স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকেও তুলে দেওয়া হচ্ছে ওই একইভাবে। কী হবে আমাদের গ্রামীণ জনাধারণের চিকিৎসা ভবিষ্যৎ?

যখনই গ্রামীণ সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা ওঠে তখনই খালি নেই নেই রব ওঠে। পাস করা ডাক্তাররা নাকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি করতে চায় না। সমস্ত রাজনৈতিক রঙের সরকারই একই কথা বলে এসেছে। অথচ ১৯৮০ সালে যদি শতকরা ৯০ ভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার থেকে থাকে, ২৫ বছর পর হঠাৎ কী ঘটল? কোনোদিন শতকরা ১০০ভাগ জায়গায় ডাক্তার নিয়োগই করা হয় নি। স্বাস্থ্য বাজেটে সে টাকাই রাখা হয় নি। কেন মফস্বলে চিকিৎসা করার জন্য অন্য পাঠক্রম তৈরি করে স্বল্পশিক্ষিত ডাক্তার পাঠানো হবে? শিক্ষিত ডাক্তারদের না থাকাটাকে ভবিতব্য মেনে

নিয়ে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' এই আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে গ্রামে কাজ করা 'কোয়াক'দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হবে? কোন গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য? সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে নামমাত্র নিজ খরচে শিক্ষিত হওয়া ডাক্তারদের গ্রামে যেতে বাধ্য করা কি এতই শক্ত?

এই প্রসঙ্গে এক আশঙ্কার কথা জানিয়ে রাখি। কেন্দ্রীয় সরকার ৪ বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স বি এসসি (কমিউনিটি হেলথ) নাম দিয়ে পাঠক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মেডিক্যাল কাউন্সিলকেও স্বীকৃতি দিতে বলা হয়েছে। আজ যখন প্রাইভেট চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রামের দিকে এগোচ্ছে তাদেরও অনেক ডাক্তার নামধারী কিছু আইনি ডাক্তার চাই। আর কিছু না হোক ডেথ সার্টিফিকেট-এ সই করার জন্য। সেই চাহিদা পূরণের জন্যই কি কিছু আইনসম্মত লোক দরকার? কলকাতার পাঁচতারা বেসরকারি অ্যালোপ্যাথি হাসপাতালগুলি কিন্তু হেমিওপ্যাথি/ আয়ুর্বেদিক/ উনানি ডাক্তারদের দিয়ে চলছে। ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। এর ওপর নতুন বিতর্ক রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা বা আর এস বি ওয়াই-কে নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মহান এই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা, যা কিনা আদতে 'চিকিৎসা' বিমা, তাতে বিপিএল তালিকাভুক্ত জনসাধারণ বছরে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিবারের ৫ জনের জন্য নিবন্ধীভুক্ত প্রাইভেট নার্সিং হোম বা হাসপাতালে চিকিৎসা বা অপারেশন করাতে পারবেন। বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ, সরকারি নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির উৎকর্ষ বৃদ্ধির কাজে না ব্যবহার করে ব্যক্তিমালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পয়সার লোভে চিকিৎসক ও নার্সিংহোমগুলির। গ্রামীণ অজ্ঞ জনসাধারণকে চিকিৎসার নাম করে অনৈতিক চিকিৎসা দিয়ে ঠকানো। সামান্য শরীর খারাপেই ভর্তি করে বেড চার্জ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার নাম করে ঐ বিমার পয়সা তুলে নেওয়া।

অতি সম্প্রতি যে সাংঘাতিক ব্যাপারটি নজরে এসেছে মহিলাদের সাধারণ মেয়েলি অসুখের সমস্যায় অকারণে জরায়ু কেটে বাদ দেওয়া বা হিস্টেক্টমি করে দেওয়া। এক বিরাট সংখ্যক তুলনামূলক ভাবে কম বয়সের মহিলা তাঁদের জরায়ু হারিয়ে বসে আছেন। আসলে যে তিনটি দেহাংশ বা অর্গান— গল ব্লাডার, অ্যাপেনডিক্স ও ইউটেরাস বাদ দিলেও মানুষ মরে না অর্থাৎ অনেকটা ডিসপোজেবল অর্গান, তার অপারেশনের সংখ্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ। বিমাকৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে কম পয়সা পাওয়ার দরুন সংখ্যা বাড়িয়ে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে ব্যক্তি চিকিৎসায় মানের অবনতি এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করছে ভগ্নস্বাস্থ্যের ধ্বংসস্তূপে।

এই প্রসঙ্গেই চিকিৎসার অবৈজ্ঞানিক ওষুধের ও অনৈতিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচিতি হয়ত আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যকে কী ভাবে ব্যবহার না করে মানুষের ক্ষতি করা হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাতৃদুগ্ধ পানকে শিশুজীবন রক্ষার মূল ইন্টারভেনশন হিসেবে গ্রহণ করায় এক শ্রেণীর চিকিৎসকদের অনীহা। জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে নবজাতককে স্তন্যপান করানো এবং প্রথম ছ মাস কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান ও তারপর থেকে বাড়ির তৈরি শক্ত খাবার ও তার সাথে সাথে মাতৃদুগ্ধ অন্তত দু'বছর বয়স পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া। শিশুপুষ্টির এই সামান্য তথ্যটুকু আমাদের চিকিৎসক সমাজ শিশুবিশেষজ্ঞ থেকে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য অধিকর্তা কারুরই অজানা নয়। এই সামান্য কাজটুকুর প্রয়োগে বিশেষ কোনো খরচও নেই। প্রয়োজন খালি একটু সদিচ্ছা, যৎসামান্য প্রশিক্ষণ এবং অবশ্যই কিছুটা নজরদারির। কিন্তু আমরা পারি নি। দুঃখের সঙ্গে জানাই যে সমস্ত ব্যক্তি বা সংগঠন এর প্রয়োগ ও প্রসারে কাজ করে চলেছেন তাদের কপালে অবহেলা ছাড়া আর কিছু জোটে নি। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সবটাই কেবলমাত্র কৃত্রিম কৌটোর দুধ প্রস্তুতকারী বহুজাতিক কোম্পনির ব্যবসায়িক ধান্দা নয়। বৃহৎ চিকিৎসক সমাজের এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব। কী ভাবে একটি অতি জরুরি শিশুপুষ্টি প্রকল্পকে বানচাল করে দিতে পারে তার বড় প্রমাণ। অথচ সবাই জানি প্রথম দু'বছরেই মানব শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ পূর্ণতা পায়। এরপরে পুষ্টি পুষ্টি করে চেঁচিয়ে প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চাদের মিড ডে মিল-এর ব্যবস্থা করে সেই প্রথম দু বছরের না পাওয়া পুষ্টির ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। ওষুধের অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও ব্যবহার এত প্রবল যে স্বল্প সময়ে তা বিশদে আলোচনা করা যাবে না। কিন্তু কয়েকটির ব্যবহার উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

১. H_2 reptor blockn/PPI/Ranitine, Pantoprazole —সচরাচর পাওয়া যায় 'র‍্যানটেক', 'প্যান' এই বলে। ২. Hormones in pregnancy—প্রোজেস্টেরোন- 'সার্জেন' বলে পাওয়া যায়। এগুলির ব্যবহার মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসকদের অবিমৃষ্যকারিতা ও এক বিরাট জনগোষ্ঠীর চটজলদি আরামপ্রিয়তা এক বৃহৎ শারীরিক ক্ষতির অশনি সংকেত দিয়ে চলেছে।

ভারতের মতো অর্থনৈতিক ভাবে শ্রেণী বিভক্ত দেশ ও যেখানে শ্রেণী পার্থক্য অনেক বেশি সেখানে রাষ্ট্রীয় কল্যাণকামী পদক্ষেপগুলি 'সবার জন্য' এই কথাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁকি আছে। ধনী দরিদ্র সবার জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ, সবার জন্য সরকারি চিকিৎসা— এর ফলেই সঠিক গুণমান যুক্ত চিকিৎসা কারুর ভাগ্যেই জোটে না। ব্যক্তি বা জনচিকিৎসার এই দুর্যোগের দিনে কী ভাবে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাব বা আন্দোলন সংগঠিত করব? ব্যক্তি মালিকানাধীন চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবেই।

তাই তাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো পরিকল্পনা করা চলবে না। আমরা যদি মোট জনগোষ্ঠীকে তিন ভাগে ভাগ করে নিই : মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০-১৫ ভাগ চাকুরিজীবী। তাঁদের চাকরিদাতা পরিচালিত চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নেবেন। এর মধ্যে শ্রম দপ্তর পরিচালিত ই এস আই হাসপাতালও থাকবে। যে সব চাকরিজীবী ব্যক্তির সে সুযোগ নেই তাদের সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

মোটামুটি সচ্ছল ও ধনী ৩০ ভাগ বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুযোগ নিন। প্রয়োজনে চিকিৎসা বিমার সুযোগ নিন। আর বাকি ৫৫-৬০ ভাগ মধ্যবিত্ত ও গরীব জনসাধারণের জন্যই কেবলমাত্র উন্মুক্ত হোক সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা। প্রথম দুই গোষ্ঠীর সেখানে কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না। এখন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার শাঁসটুকু প্রভাবশালী বা রাজনীতির লোকেদের সুপারিশ পাওয়া সামাজিক ভাবে সচ্ছল ব্যক্তিরা আত্মসাৎ করে চলে যায়। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সরকারি ব্যবস্থায় চিকিৎসিত হতে হলে একটি স্মার্ট কার্ড-এর মতো ব্যবস্থা থাকবে। সেটি যারা দেখাবে তারাই শুধু চিকিৎসা পাবে। একমাত্র আপৎকালীন চিকিৎসায় হয়ত কিছুটা ছাড়ের কথা ভাবা যেতে পারে। এর ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে জানা ও পরিকল্পনা করা সম্ভব ঠিক কতজনকে চিকিৎসা দেওয়া হবে এবং কী চিকিৎসা দেওয়া হবে। এখনকার মতো 'সব' চিকিৎসা 'সবাই'কে নয়। এইভাবে চিকিৎসার এক সর্বজনীন ও সমবণ্টন কিছুটা দেরিতে হলেও সম্ভব। এরপর যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হল চিকিৎসার গুণমান। একদিকে জনচিকিৎসার বণ্টন ব্যবস্থার গুণমান ও অন্যদিকে ব্যক্তি চিকিৎসার মান। জনচিকিৎসার মান নির্ভর করে মূলত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। আমেরিকার চেয়ে অনেক গরীব দেশ হওয়া সত্ত্বেও কিউবার জনচিকিৎসার মান এই কারণেই অনেক ওপরে। কিন্তু ব্যক্তি চিকিৎসা? রোগী দেখা, তার কথা শোনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, ফলাফল— প্রয়োজনে পুনর্বাসন, এ সমস্তের মধ্যে একটা সততা আন্তকিতা ও সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। এর সঙ্গে চিকিৎসা পরিকাঠামো ও চিকিৎসা কর্মীর বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক মান জড়িয়ে আছে। চিকিৎসা মানের রাজনৈতিক বা সামাজিক উপাদানটি জনগণ বুঝলেও বৈজ্ঞানিক মান জনগণের পক্ষে ধরা বা বোঝা সম্ভব নয়। নয় বলেই নিচু মানের চিকিৎসাদাতা খুব সহজে রোগীকে ভুল বোঝাতে পারে। অবলীলায় ঠকাতে পারে। এদেশে চিকিৎসক সমাজে ব্যবসায়ী প্রতুল, গবেষক অপ্রতুল, বিজ্ঞানমনস্কতা বিরল। দুর্ভাগ্য সেই দেশ বা জাতির, যেখানে চিকিৎসকরা তঞ্চকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এখানেই প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানোর কাজ করে এদের ওপর নজরদারির কাজ চালানো। 'উৎস মানুষ'-এর প্রয়োজন এইজন্যই। প্রয়োজন সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎকর্ষের তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেখানে মানুষের ঠকার ভয় নেই।

চিকিৎসা সম্বন্ধে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই জন্যই যে চিকিৎসার ব্যাপারে মানুষ বড় অসহায়। আর আজকের ঝাঁ চকচকে প্রতিষ্ঠান— আওয়াজ মুখরিত অনুষ্ঠান— সুসজ্জিত ব্যক্তি চিকিৎসকের আড়ালে সু-চিকিৎসা দুর্লভ। আমি বিশ্বাস করি আমাদের সমবেত আন্দোলন হওয়া উচিত রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসারে ও স্লোগান তোলা দরকার— দরিদ্র জনগণের চিকিৎসার ভার রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আর একটা প্রস্তাব ভেবে দেখতে পারেন সবাই। আর এস বি ওয়াই (রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা)-কে যদি আমরা সত্যিই 'স্বাস্থ্য বিমা' করতে পারি ('চিকিৎসা' বিমা নয়)। অর্থাৎ নিয়মিত আপাত নীরোগ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের আনুষঙ্গিক পরীক্ষা ইত্যাদি, যা কি না রোগ প্রতিরোধ বা রোগকে প্রাথমিক স্তরে নির্ণয় করতে পারে, তাহলে বোধহয় অনেকগুলো লক্ষ্যকে একসঙ্গে অর্জন করতে পারি।

এবার আমার ব্যক্তিগত একটি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করি। গ্রাম বাংলায় দীর্ঘদিন ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্য। সীমাহীন বেকারত্বের জ্বালায় পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলগুলি এখন প্রায় যুবক শূন্য। কাজের খোঁজে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশে দেশ পেরিয়ে আরব দেশে, সাগর পেরিয়ে সাউথ আফ্রিকা বা ব্রুনাই দ্বীপে। তাদের পরিবার সন্তানাদি সব এখানে। বছর-দু'বছরে ঘরে ফেরা। বিভিন্ন জনস্বাস্থ্যমূলক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সমস্যা জটিল হয়ে উঠছে। কিছু করা দরকার। ভেবে দেখবেন।

এতক্ষণ ধরে যা বলেছি তা বহুদিন ধরে যে সব স্তিাশীল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের চিন্তার সূত্র ধরে ও নিজের পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে। এ সবের বিরোধী মত থাকতেই পারে। বিতর্ক উঠতেই পারে। এ জীবনের ষষ্ঠ দশকের শেষ ভাগে এসে অন্ধকারাচ্ছন্ন চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিবেশ দেখে হতাশাও আসে। কিন্তু পরক্ষণেই এই প্রত্যয় কাজ করে, সব সময় সব মানুষ কখনো অসৎ হতে পারে না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখেই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি পংক্তি আমি আওড়াতে চাই—

"কোথাও মানুষ ভালো রয়ে গেছে বলে
আজও তার নিঃশ্বাসের বাতাস নির্মন;
যদিও উজির, কাজি, শহর-কোটাল
ছড়ায় বিষাক্ত ধুলো ঘোলা করে জল
তথাপি মানুষ আজও শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীন কোলে মাথা রাখে
উপোসেও রমণীকে বুকে টানে; কারও
সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে।"

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: চিকিৎসার কথা— সুজিতকুমার দাশ। ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০৬]

উমা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বক্তৃতা দিচ্ছেন ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধায়

ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন স্বাতী ভট্টাচার্য

গান গাইছেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

বইয়ের উদ্বোধনে শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস ও শ্রী নিবারণ সাহা

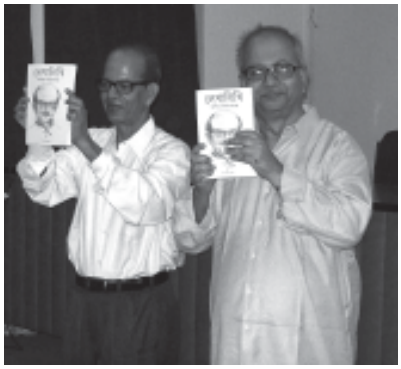

বইয়ের উদ্বোধনে অশোকের দুই দাদা ডাঃ দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩, কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডল সভাকক্ষে উৎস মানুষ আয়োজিত ৫ম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রী শ্যামল ভদ্র উৎস মানুষের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। এরপর পূর্ণ সভাকক্ষে দরাজ গলায় গান গেয়ে শোনান শ্রী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গান, পরে লোকগান— যা তিনি বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলনের সময় সংগ্রহ করেন ও শিখে নেন। এইদিন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার সংকলন 'লেখালিখি' প্রকাশিত হয়। শ্রী নিবারণ সাহা 'লেখালিখি' বইটি নিরঞ্জন বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন। বৈঠকখানা রোডে শ্রী সাহার ঘরে উৎস মানুষের জন্ম। শ্রী বিশ্বাস দীর্ঘ সময় ধরে হরিণঘাটায় উৎস মানুষ পাঠচক্র চালিয়ে যাচ্ছেন।

বক্তা ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেন স্বাতী ভট্টাচার্য (যিনি ২০১২-র স্মারক বক্তৃতা দেন)। ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় স্বভাবসুলভ ঢঙে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে মানুষের দৈনন্দিন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে ক্ষোভের প্রকাশ হচ্ছে সেটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলেই উল্লেখ করেন। চিকিৎসার নামে রাহাজানি যে কোন মাত্রায় পৌঁছেছে ডাঃ মুখোপাধ্যায় তা নিয়ে নানা ঘটনার উল্লেখ করেন। কেবলমাত্র মুনাফার লোভে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে কর্পোরেট হাউসগুলোর শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে তা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকারকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। সরকারি চিকিৎসার মানবিক মুখ কর্পোরেটের জোরালো আলোয় পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে তা নিয়ে বক্তার হতাশা প্রকাশ পায়। শ্রোতারাও ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন তা মূলত সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে। তাঁরা যে কতটা উদ্বিগ্ন তা বোঝা যায়। ডাঃ মুখোপাধ্যায় প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

রোগী তো নয় বহুফসলী জমি

জয়দেব গুপ্ত

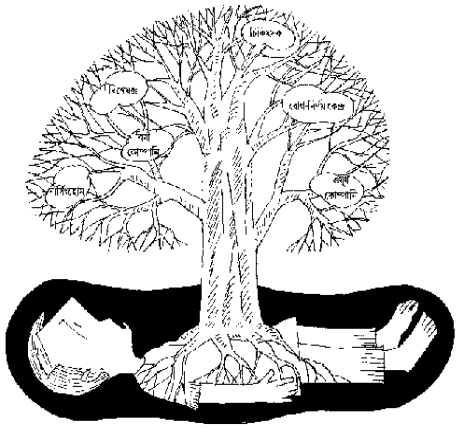

ছবি : দেবাশিস রায়

গ্রান্ড হোটেলের কনফারেন্স রুমে একটি বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানির মার্কেটিং ডিভিসনের (বিপণন বিভাগের) ম্যানেজারদের সেলস্ কনফারেন্স চলছে। এখানে সব কথাই ইংরাজিতে হয়। যতটা সম্ভব বাংলা করে লিখছি।

মার্কেটিং ম্যানেজার নতুন আনা একটি ওষুধের মার্কেটিং প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছেন।

এটা নতুন অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ (হাই ব্লাড প্রেসারের ওষুধ)। এখনও অবধি মাত্র তিনটে কোম্পানি এটা মার্কেটে এনেছে। আমরা চতুর্থ। এর প্রোডাক্ট ট্রেনিং আপনারা ইতিমধ্যে নিয়েছেন। এটা শুধুমাত্র ব্লাড প্রেসার কমানোই নয়, তার সঙ্গে কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়া হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং সাডেন ডেথ-এর সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। মার্কেটে যত অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ আছে, এটা সবচেয়ে সেফ। এখন আপনারা বলুন, এর মার্কেটিং প্ল্যান কীভাবে প্রয়োগ করবেন?

রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী মিট্রা বললেন, "মার্কেটিং প্ল্যান এবং টার্গেট তো আপনারা অলরেডি আমাদের দিয়েছেন। প্রতি টেরিটরিতে অর্থাৎ প্রত্যেক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভকে প্রতি দশজন সিলেক্টিভ কার্ডিওলজিস্টকে প্রাথমিক ভাবে এটা প্রোমোট করতে হবে। এবং এই দশজন কার্ডিওলজিস্টকে প্রত্যেক টেরিটরির টপ কার্ডিওলজি কনসালট্যান্ট হতে হবে।"

মার্কেটিং ম্যানেজার বললেন, "ঠিক, এটা তো প্ল্যানিং। কিন্তু ইমপ্লিটেশন (অর্থাৎ প্রয়োগ) যথাযথ হতে হবে। একজন কার্ডিওলজিস্ট যদি দিনে মাত্র একটা প্রেসক্রিপশন করেন, তাহলে অন্তত ছ'মাসের জন্য একজন পেশেন্ট সেটা কিনে খাবে। অর্থাৎ একটা প্রেসক্রিপশনে ১৮০টা ট্যাবলেট বা ১৮টা স্ট্রিপ বিক্রি হবে। সেক্ষেত্রে একটা প্রেসক্রিপশন-এর মোট মূল্য হবে ১৮×১৮০= ৩২৪০ টাকা। সেই ডাক্তার যদি রোজ একটা করে মাত্র ছ'মাস এই প্রোডাক্ট প্রেসক্রাইব করে, তাহলে একজন ডাক্তার যে সেল দেবে তার মূল্য ৩২৪০×১৮০ দিন=৫,৮৩, ২০০টাকা। তাহলে দশজন ডাক্তারের থেকে আমরা পাচ্ছি প্রায় ৫৮ লাখ টাকার সেল। একজন এরিয়া ম্যানেজারের টিমে যদি পাঁচজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, তবে ছমাসে মোট সেল বাড়বে ৫৮ লাখ×৫জন=২৯০ লাখ বা ২ কোটি ৯০ লাখ টাকা। আপনাদের টার্গেট অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আর ভাবতে হবে না। এই একটা মাত্র প্রোডাক্ট দিয়েই আপনারা টার্গেট করতে পারবেন। ইনসেনটিভ প্ল্যানও আপনারা জানেন। এই একটা প্রোডাক্ট থেকেই হাজার হাজার টাকা ইনসেনটিভ পেতে পারেন।

এরিয়া ম্যানেজার সেনগুপ্ত বললেন, "বুঝলাম স্যার, কিন্তু এর আগে যে তিনটে কোম্পানি এই প্রোডাক্ট লঞ্চকরেছে, তাদের দাম প্রতি স্ট্রিপ ৪০ টাকা বা ৫০ টাকা। সেখানে আমাদের দাম প্রতি স্ট্রিপ ১৮০ টাকা! ডাক্তার তো প্রশ্ন করবে। প্রেসক্রিপশন করতে চাইবে না।"

প্রোডাক্ট ম্যানেজার দেশপাণ্ডে এবার বললেন, "মিস্টার সেনগুপ্ত, প্রোডাক্ট ট্রেনিংয়ের সময় আপনাদের জানানো হয়েছিল, এটা সাসটেন্ড রিলিজ ট্যাবলেট। আমাদের ট্যাবলেটে তিনটে লেয়ার আছে। এক একটা করে লেয়ার এক এক বারে রিলিজ হয়। ফলে ড্রাগ কনসেনট্রেশন ২৪ ঘণ্টা ধরে সমান থাকে। টেকনোলজির ব্যাপারটাও আপনাদের ডাক্তারের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং এই টেকনোলজির কারণেই হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং সাডেন ডেথ-এর সম্ভাবনা কমে যাবে।

এরিয়া ম্যানেজার শর্মা জানতে চাইলেন, "স্যার, মার্কেটিং প্ল্যান এবং টার্গেট তো বুঝলাম; প্রমোশনাল ইনপুট (বিপণনের সাহায্যে) কী কী দেবেন?

মার্কেটিং ম্যানেজার উল্টে প্রশ্ন করলেন, "কী চান বলুন? লিটারেচার, স্যাম্পল, নানারকম গিফট, ওয়াইনিং, ডাইনিং এমনকি এ পি আই কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক্তারের সব খরচ আমরা বহন করব। ফ্লাইট টিকিট, হোটেলের খরচ এবং মদের বোতল পর্যন্ত। ডাক্তার চাইলে তাকে পরিবারশুদ্ধু ব্যাংকক, পাটায়া

বা সিঙ্গাপুর ঘুরিয়ে আনতেও আমরা রাজি। কিন্তু শর্ত একটাই— প্রতিদিন অন্তত একটা করে প্রেসক্রিপশন অন্তত ছ'মাস ধরে ডাক্তারকে লিখতে হবে। ডাক্তারকে সেই কথা রাখতে হবে। সুতরাং এর জন্যে ডাক্তারপিছু এক থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছে।

এরিয়া ম্যানেজার দুবে একটা সমস্যার কথা প্রকাশ করলেন, স্যার, আরো একটা সম্ভাবনা আছে। ডাক্তার তো লিখলেন আমাদের ব্র্যান্ড কিন্তু ওষুধের দোকানদার অনেক সময় ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে অন্য কোম্পানির সস্তার ওষুধ দিয়ে দেয়।

রিজিওনাল ম্যানেজার উত্তর দিলেন, "একটু মাথা খাটান না। উপায় বেরোবে। যেমন ধরুন, ডাক্তার প্রেসক্রিপশনের ওপর একটা স্ট্যাম্প মেরে দিলেন 'ডু নট চেঞ্জ দ্য মেডিসিন'।"

দুবে : তার মানে ডাক্তারকে একটা স্ট্যাম্প বানাতে হবে?

রিজিওনাল ম্যানেজার : না, আপনারাই বানিয়ে ডাক্তারকে প্রেজেন্ট করবেন। অটো ইঙ্ক রাবার স্ট্যাম্প পাওয়া যায়। এরকম পঞ্চাশটা বানিয়ে নেবেন। এবং বিলটা এক্সপেন্স স্টেটমেন্টে চার্জ করবেন। সেটা পাস করা হবে।

দুবে : কিন্তু সেটা কি এথিক্যাল হবে?

মার্কেটিং ম্যানেজার : এথিক্যাল! ডাক্তারকে মদ খাওয়াচ্ছেন, মাইক্রোআভেন দিচ্ছেন, সেটা এথিক্যাল? এথিক্সের নিকুচি করেছে। আসল কথা বিজনেস, ব্যবসা, সেল, ধান্দা। খেমটা নাচতে মাথায় ঘোমটা দিচ্ছেন কেন?

সেনগুপ্ত : কিন্তু স্যার, শুনেছি, এই প্রোডাক্টটার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট প্রতি স্ট্রিপ মাত্র সাড়ে ছ' টাকা!

মার্কেটিং ম্যানেজার : ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট নিয়ে আপনি কী করবেন! আপনাদের স্যালারি আছে না! ডেলি অ্যালাওয়েন্স আছে না! ইনসেনটিভ আছে না! ডাক্তারের জন্য গিফট, ওয়াইনিং, ডাইনিং আছে না! এ পি আই ব্যাংকক পাটায়া ট্রিপ আছে না! কোত্থেকে আসবে এগুলো? পেশেন্টের পকেট নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি মাইনে পাচ্ছেন কোম্পানি থেকে, সুতরাং কোম্পানির সেল নিয়ে ভাবুন। আমরা দাতাকর্ণ হতে আসি নি। আপনিও করে খান, কোম্পানিও দুটো লাভের মুখ দেখুক। জেনে রাখবেন, আপনি, আমি, ডাক্তার, ওষুধের ডিস্ট্রিবিউটর ওষুধের দোকানদার— সবাই করে খাচ্ছি পেশেন্টের পকেট কেটে। মনে রাখবেন, সমাজসেবা করার জন্য আপনাকে মাইনে দেওয়া হয় না!

একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ডক্টর বাগচীর কাছে একটা ফোন এল।

—হ্যালো, ডক্টর বাগচী, ...ডায়াগনস্টিক থেকে বলছি।

—হ্যাঁ, বলুন।

— আপনি এ মাসে যে কেসগুলো পাঠিয়েছিলেন, তার কমিশনের পেমেন্ট কি চেকে দেব না ক্যাশে?

— ক্যাশে দেবেন। কবে আবার চেকে দিয়েছেন! চেকে দিলে আমি ইনকামে দেখাবো কী ভাবে?

— ও কে, স্যার। কালকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

— একটা কথা। অন্য একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার তো ৩০% দেয়। আপনারা মাত্র ২০% দিচ্ছেন কেন?

— কেস অনুযায়ী রেট হয় স্যার।

— আমি তো সব কেসই আপনাদের কাছে পাঠাই। ই সি জি তো রেগুলার আছেই; সঙ্গে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বা হল্টার ই সি জি-র কেসও দিই।

— অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বা হল্টার ই সি জি তো কম হয় স্যার।

— বাজে কথা বলবেন না। অনেক সময় দরকার না হলেও পেশেন্টকে দিয়ে ঐ টেস্টগুলো করাই। সে তো আপনাদের কথা ভেবেই, নাকি?

— আমরাও তো আপনার কথা ভাবছি স্যার। মাসে প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা কমিশন তো আপনার কাছেই যায়। কোনদিন তো ফেল হয় নি।

— ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবুও কিছু কিছু কেসের ক্ষেত্রে কমিশনটা একটু দেখে নেবেন।

— সবই তো স্যার পেশেন্টের টাকা। আপনিও পান, আমরাও পাই। পেশেন্টের দরকার হলেও পাই, দরকার না হলেও পাই।

— ঠিক আছে, এখন রাখুন। টেলিফোনে এসব কথা বেশি না বলাই ভাল। রাখছি।

প্রিয় পাঠক, (কিংবা বেচারা পেশেন্ট)

এতক্ষণ যেটুকু পড়লেন, সেটা লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়; একশো ভাগ সত্যি এবং লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা জাত। ওষুধ কোম্পানি, কিছু ডাক্তার (সবাই নয়), পেস মেকার প্রস্তুতকারক সংস্থা ও বিভিন্ন ডায়াগনেস্টিক সেন্টারগুলো এইভাবেই সাধারণ মানুষকে ঠকায়, তাদের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করে, তাদের সর্বস্বান্ত করে। আমরা জানতাম, ডাক্তারি একটা নোবল প্রফেশন। কিন্তু যেখানে রক্ষকই ভক্ষক হয়ে ওঠে, সেখানে সাধারণ মানুষ লুণ্ঠিত হয়।

তবে, এখানে অবধারিতভাবে যে প্রশ্নটা আসবে, সেটা হল, সাধারণ মানুষ কি করবে? তাদের তো উপায় নেই। অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, ডাক্তারবাবু যা ওষুধ লিখবেন, তাই কিনতে হবে বা পেস মেকার বসাতে হবে— সাধারণ মানুষের তো গত্যন্তর নেই। তবে?

ঠিকই, এই মুহূর্তে আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই। তবে

সাধারণ মানুষ সচেতন হলে, আগামী দিনে হয়তো এই লুটপাট কিছুটা হলেও কমতে পারে।

সাধারণ মানুষ যা করতে পারে, সেটুকুই নাহয় করি আমরা—

১) আপনার কী রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে জানতে চান। এটা আপনার অধিকার। ২) যে রোগটি হয়েছে তার প্রতিকারের কী কী অপশন (উপায়) আছে তা জানতে চান। একটিই রোগের চিকিৎসার বিভিন্ন স্তর থাকে— প্রাথমিক স্তর, মধ্যম স্তর ও চূড়ান্ত স্তর। আপনি প্রাথমিক স্তরের রোগী হলে চূড়ান্ত স্তরের চিকিৎসা করবেন কেন? উদাহরণ দিই— আপনার সাধারণ সর্দি কাশি জ্বর হয়েছে, সাধারণ ৫০ পয়সার প্যারাসিটামল খেলে এবং একটু সাবধানে থাকলেই আপনি সেরে যাবেন। সে ক্ষেত্রে কেন আপনার ব্লাড টেস্ট করানো হবে অথবা কেন ২০০ টাকার অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে? ৩) ডাক্তার কোনো রকম ডায়গনস্টিক টেস্ট করতে বললে, জানতে চান কেন সেগুলো করতে হবে? (ভয় পাবেন না, আপনি অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা করাচ্ছেন, সব কিছু জানার অধিকার আপনার আছে)। ৪) কোনো একটা ওষুধ ডাক্তার লিখলে, তার কোনো সাবস্টিটিউট আছে কিনা দোকান থেকে খোঁজ নিন। (জানবেন, মোটামুটি নাম করা সব কোম্পানির ওষুধের গুণমান একই থাকে। এমনকি জেনেরিক ওষুধ, যেগুলো খুব কম দামে পাওয়া যায়, তারও গুণমান একই থাকে। এখন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে জেনেরিক ওষুধের দোকান থাকে। খবর নিন। ডাক্তারের ব্যাংকক পাটায়া বেড়াতে যাওয়ার খরচ জোগানোর দায়িত্ব আপনার নয়।) ৫) ডাক্তার পেসমেকার বসাতে চাইলে আপনার চেনা কোনো ডাক্তারের থেকে সেকেন্ড ওপিনিয়ন (দ্বিতীয় পরামর্শ) নিন। যদি আপনার চেনা কোনো ডাক্তার না থাকে, তবে প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধবের থেকে তেমন ডাক্তারের খোঁজ নিন। ৬) আগে প্রত্যেক পরিবারের একজন ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান থাকতেন। তিনি পরিবারের সবাইকে দেখতেন। ফলে ওই পরিবারের কার কী রকম সমস্যা হয় বা হতে পারে, তিনি জানতেন। এবং ওই চিকিৎসকের সঙ্গে পরিবারের সকলের একটা মানবিক বন্ধন গড়ে উঠত। এই ব্যবস্থাটা ফিরিয়ে আনুন। আপনার পরিবারের চিকিৎসার জন্য নিজের লোকালয়ে কোনো জেনারেল প্র্যাকটিশনার ঠিক করুন। প্রাথমিকভাবে পরিবারের যে কোনো কারুর কিছু অসুখ হলে, তাঁর কাছে আগে যান। তিনি যদি বোঝেন এবং বলেন, তবেই কনসালট্যান্টের কাছে যাবেন। কনসালট্যান্ট কী বললেন বা কী প্রেসক্রিপশন লিখলেন, তা ঐ পারিবারিক ডাক্তারবাবুকে জানান। ৬) কোনোরকম ডায়াগনস্টিক টেস্ট করতে হলে, ডাক্তার এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে কৌশলে জানিয়ে রাখুন যে আপনি ঐ কমিশনের ব্যাপারটা জানেন। (লজ্জা পাবেন না। আপনার লজ্জিত হওযার কোনো কারণ নেই। যারা কমিশন দিচ্ছে বা নিচ্ছে, লজ্জিত হওয়ার কথা তাদের।)

সব শেষে বলি, এখনও অনেক ডাক্তারবাবু আছেন যাঁরা অর্থের লোভে নিজেদের মানবিকতাকে বিক্রি করে দেন নি। যাঁরা আজও ডাক্তারি নামক নোবেল প্রফেশনকে সেবা হিসেবে ভাবেন। এমন মানুষ খুঁজে বার করুন। তাঁদের জন্য একটা নমস্কার বা প্রণাম তুলে রাখুন। তবে যেহেতু তাঁদেরও বাঁচতে হবে, সংসার চালাতে হবে, তাঁদের প্রাপ্য দক্ষিণাটুকু দেবেন। তাঁদের মানবিকতাকে নিজের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করবেন না।

উমা

Declaration

বিধিসম্মত ঘোষণা

প্রকাশক	:	বরুণ ভট্টাচার্য
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
প্রকাশস্থান	:	ঐ
স্বত্বাধিকারী	:	'উৎস মানুষ' সোসাইটি
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
মুদ্রক	:	শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন,কলি-৯
সম্পাদক	:	সমীরকুমার ঘোষ
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৫২/৫১, এস বি নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৩৬

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে সত্য।

সা : বরুণ ভট্টাচার্য

বইমেলায় আমাদের

স্টল নং ১৭৫

চলন্ত গাড়িতে বই পড়া

প্রশান্ত চক্রবর্তী

আমরা যখন কোনো কিছু দেখি বা পড়ি তখন সেই বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি চোখের প্রতিসরণ মাধ্যমগুলি অর্থাৎ কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স, ভিট্রিয়াস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে চোখের পিছনের আলোক সংবেদনশীল স্নায়ুপর্দা বা রেটিনা এবং সর্বোপরি ম্যাকুলা ওপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। রেটিনা বা ম্যাকুলান মধ্যের বড় ও কোণে সেই আলোকরশ্মি নানান রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্ট করে। এর ফলে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যা অপটিক নার্ভ দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। দুটি চোখ থেকেই এই স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং মস্তিষ্ক কেবলমাত্র একটি সোজা প্রতিবিম্ব দেখতে সাহায্য করে।

এই সমগ্র প্রক্রিয়ার জন্য রেটিনায় স্থির প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যখন আমরা বাড়িতে বসে অর্থাৎ স্থিরভাবে কোনো বই পড়ি তখন বইয়ের শব্দগুলি এই স্থির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

এ ক্ষেত্রে একটি জরুরি শর্ত হল চোখ দুটিকে শব্দের উপর নিক্ষেপ করতে হবে যাতে শব্দ থেকে নির্গত আলোকরশ্মি চোখের মণির মধ্যে প্রবেশ করে। এই কাজটি করে একেকটি চোখের ছটি করে মোট ১২টি চক্ষুবহির্ভূত মাংসপেশির (Extra ocular muscles) সমন্বয়ে। এছাড়া চোখের মধ্যে অবস্থিত ciliary muscle নামক মাংসপেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলে চোখের ভিতরকার লেন্সটির আকারের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে শব্দগুলি ম্যাকুলার ওপর ফোকাস করে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রক অবশ্যই মস্তিষ্ক।

সাধারণত আমাদের চারপাশের বিভিন্ন বস্তু যে দেখি তাতে সবসময়ই চোখ দুটিকে কমবেশি ঘুরিয়ে এবং ciliary muscle-এর ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটানো হয়, এমনকি পড়ার সময় এক শব্দ থেকে পরবর্তী শব্দে বা এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চোখ নিক্ষেপিত হয়। এতে অধিকাংশ লোকেরই কোনো অসুবিধা হয় না।

কিন্তু আমাদের চারপাশের বস্তুগুলি যদি খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন করতে থাকে তাহলে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় সেকেলের ভগ্নাংশে এবং সেটা ক্রমাগত করতে হয়। যেমন আমরা যখন ট্রেন বা গাড়িতে ভ্রমণ করি তখন বাইরের জিনিসগুলি একের পর এক আমাদের চোখে পড়ে। চোখ চলে যাওয়া বস্তু থেকে আগত বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করে খুব দ্রুত, এই জাতীয় চোখের চলনকে বলা হয় Optokinetic Nystagmus।

আবার যে বস্তুর উপর আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি সেটা যদি খুব দ্রুত নড়াচড়া করে, তবে চোখদুটিকে খুব দ্রুত ঘোরানোর প্রয়োজন হয় এবং ciliary-কে খুব দ্রুত সংকোচন-প্রসারণ করতে হয়। চলন্ত গাড়িতে বই পড়ার সময় ঠিক এটাই ঘটে।

এই যে একের পর এক বস্তুতে দৃষ্টির স্থানান্তরিত করা (Optokinetic Nystagmus movement) এবং দ্রুত নড়তে থাকা বস্তু ভাল করে ফোকাস করে দেখা, এই দুটি ক্ষেত্রেই Extra ocular muscles এবং ciliary muscles-এর বারবার সংকোচন-প্রসারণের ফলে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর এই সমন্বয় ঘটানোর জন্য মস্তিষ্কও ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়ে।

চোখের অবসন্নতার ফলে চোখে ব্যথা হতে শুরু হয়, চোখদুটি লাল হয়ে যায়, কখনও কখনও আবার ফুলেও ওঠে।

মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কাজের ফলে মাথাব্যথা হতে থাকে, ঘুম পায়, সারা শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে যায়। বমিবমি ভাব হয়, মাথা ঘুরতে থাকে, যাকে পরিভাষায় বলা হয় মোশন সিকনেস। এমনকি কী পড়া হচ্ছে তা মাথায় ঢোকেও না।

তবে সহনশীলতা একেক জনের একেক রকম। কেউ কেউ কয়েক মিনিট চলন্ত গাড়িতে পড়লে বা বাইরের দিকে তাকালে এই উপসর্গ দেখা দেয়, আবার কেউ কেউ দীর্ঘক্ষণ এটা চালিয়ে যেতে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষেরই ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই অসুবিধা হতে থাকে।

রাস্তা মসৃণ হলে বই কম নড়াচড়া করায় পড়তে কম অসুবিধা হয়। কিন্তু রাস্তা অসমান এবং উঁচু-নিচু হলে অসুবিধা বেশি হয়। তখন না পড়াই ভাল। তবে চলন্ত গাড়িতে পড়তে গেলে বইটিকে শক্ত করে ধরতে হবে যাতে তার নড়াচড়া কম হয়। আলো উপযুক্ত হওয়া চাই। মোটামুটি আরামে বসার ব্যবস্থা থাকা চাই। এই শর্তগুলি বজায় থাকলে সময় কাটানোর জন্য চলন্ত গাড়িতে বই পড়া যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে বুঝে নিতে হবে তার নিজের কতটা সমস্যা হচ্ছে। সেইমতো সে পড়বে কি পড়বে না তা ঠিক করতে হবে।

উমা

দুর্বোধ্য নিদানপত্র: চিকিৎসক ও রুগীর দায়িত্ব

গৌতম মিস্ত্রি

চিকিৎসা পেশার বিজ্ঞজনের উদ্দেশে প্রধানত এই প্রসঙ্গের অবতারণা। যদিও উপভোক্তা বনাম সাধারণ মানুষ এটা পড়ে দু'ভাবে উপকৃত হতে পারেন। প্রথমত, চিকিৎসককে অনুরোধ করতে পারেন বোধগম্যভাবে চিকিৎসা পরামর্শ দেবার জন্য, আবার উৎসাহ থাকলে প্রেসক্রিপশনের সাংকেতিক ভাষার মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারেন। কেবল বিক্রেতা বা পরিষেবাপ্রদানকারী সংস্থা বা ব্যক্তির শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে এই যুগের বিনিময়প্রথা চলে না। বাজারে আলু কেনার সময় যেমন আপনাকে পচা আলু বাদ দিয়ে কিনতে হয়, ওজন দেখে নিতে হয়; এই সময়ের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে চিকিৎসা পরিষেবা ক্রয়ের সময়ও দেখে নিতে হবে, আপনার অর্থ আর আয়াসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং আপনার অসহায় অবস্থার সুযোগে কেউ তার পাওনার চেয়ে বেশি পকেটে ভরছে কিনা। আপশোস করে লাভ নেই, আগেকার চিকিৎসক-রুগীর মধ্যে বিশ্বাস ও ভরসার সেই সেতুটি ভেঙে গেছে। সৎ চিকিৎসা পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ এখন আইনের হাতে। আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা আর দীর্ঘসূত্রিতার জন্য তা চিকিৎসার চিকিৎসায় অসফল, এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। শেষ অবলম্বন রুগী আর উপভোক্তার সচেতনতা। জেনে নিন ডাক্তারের পরামর্শ নেবার পর অথবা হাসপাতাল থেকে ছুটি হবার পর পরে ডাক্তার বা হাসপাতাল স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে না জানালে আপনাকে কোন কোন তথ্য জেনে নিতে হবে। চিকিৎসার উৎকর্ষ বিচার বা চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচনা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। সঠিক, প্রাসঙ্গিক, পূর্ণ ও গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও পরিষেবাপ্রদানকার রুগীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারনা।

প্রেসক্রিপশন কার উদ্দেশে লেখা হয় :

খেয়াল করে থাকবেন, চিকিৎসকেরা অনেক সময় ওষুধ লেখার আগে ℞ নামে একটি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। এটি একটি লাতিন ক্রিয়াশব্দ (recipe, recipere, "to take" or "take thus") থেকে এসেছে, যার অর্থ আপনি নিন। লক্ষ্য করুন, কথাটা নিন, দিন নয়। অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন নিশ্চয় করে রুগী উদ্দেশে লেখা, ওষুধের দোকানদার বা অন্য কারও নয়। তাই যদি হবে, তবে রুগীর বোধগম্য করে নিদান লেখাটা চিকিৎসকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে প্রেসক্রিপশন লেখার নিয়ম অন্তর্ভুক্ত আছে। ব্যবহারিক ফার্মাকোলজি শিক্ষায় দস্তুরমত এর শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকায় প্রতি বছরে ৭০০০ রোগীর মৃত্যুর কারণ হিসাবে অস্পষ্ট হাতে লেখা প্রেসক্রিপশনকে দায়ী করা হয়েছে (ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিস অব সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন, জুলাই ২০০৬)। প্রেসক্রিপশন কথাটা এসেছে 'pre' (before, পূর্বে) এবং 'script' (writing, written, লিখিত) থেকে। অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন হল রোগীর উদ্দেশে রোগ উপশমের জন্য পূর্বে লিখিত একটা নথি। এই নথিটি চার ধরনের মানুষের কাছে বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়— রোগী, ওষুধের দোকানদার, অন্য একজন চিকিৎসক ও এই রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কিত অন্য যে কোনও চতুর্থ ব্যক্তি বা সংস্থা (যেমন, চিকিৎসবিমা সংস্থা, বিচারবিভাগ ইত্যাদি)।

যত বড় ডাক্তার তত দুর্বোধ্য লেখা

মাপ করবেন, ছোট বড়র এই শ্রেণীবিভাগটা চলতি ধারণা অনুযায়ী; আমার সমর্থনপুষ্ট নয়। মোটা অর্থের সাম্মানিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দেখা মেলা ও খুব অল্প সময়ে খসখস করে লেটারহেডে দু'চারটা আঁকিবুকি এঁকে বিদায় দেন যাঁরা, তাঁদের বড় ডাক্তার বলাটাই রেওয়াজ। একটা বেঠিক পদ্ধতি ক্রমাগত ঘটতে থাকলে, সেটাই ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে দুর্বোধ্য লেখা আমরা কেমন যেন মেনে নিয়েছি। প্রেসক্রিপশন কেবল কিছু বিশেষ ওষুধের দোকানদারই কেন পড়তে পারবে? ওষুধের দোকানদার মাঝে মাঝে ভুলও করে ফেলে। আপনি নিরক্ষর না হলে আপনাকে

তো মিলিয়ে দেখতে হবে! ডাক্তারের হাতের লেখা যে সব সময় দুর্বোধ্য হয় তা কিন্তু নয়। একই ডাক্তার যখন বিদেশে যাবার জন্য ভিসার আবেদন করেন, সে লেখা বেশ পড়া যায়। অর্থাৎ চাইলে পাঠযোগ্য তথ্য ডাক্তাররা লিখতে পারেন। দৃষ্টিনন্দন বা ক্যালিগ্রাফির প্রয়োজন নেই, পড়ে অর্থ বোঝা যায় এমনটা লিখতে না পারলে, প্রেসক্রিপশন লেখার জন্য আলাদা পেশাদার অথবা যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। আজকাল অবশ্য বেসরকারি হাসপাতালের কিছু নথি কম্পিউটার থেকে বেরোয় বলে কিছুটা সুবিধা হয়েছে। এখন আর বিনামূল্যে পরিষেবা না পাওয়া গেলেও সরকারি হাসপাতালের নথি এখনও নিউজপ্রিন্ট সদৃশ কাগজে ক্ষুদ্রকায় হরফে প্রত্নতত্ত্ববিদের আগ্রহ উদ্রেককারী ছিন্নপত্র মাত্র। শেষোক্ত নথি দেখে একমাত্র সরকারি হাসপাতালের সংলগ্ন ওষুধের দোকানগুলি ওষুধ বেচতে পারে ও প্রয়োগবিধি বোঝাতে পারে। এই সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধারে যে বেশ কিছুটা অনুমান মেশাতে হয় তা বুঝতে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। আপনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের এই মধ্যযুগীয় অপব্যবহারে চিকিৎসক ও চিকিৎসাপ্রদানকারী সংস্থার কোনো হেলদোল নেই। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। সেটা সম্ভব হবে যদি আপনি আপনার অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন।

অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও অগোছালো শব্দে ভরা তথ্য জরুরি তথ্য

প্রথমে দেখা যাকে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে কী কী তথ্য থাকা জরুরি। রুগীর নাম, বয়স, ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকবে। ডাক্তারের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও মজুত থাকলে ফ্যাক্স ও ইমেল আইডি থাকা উচিত। রুগীর কষ্টের বিবরণ এবং চিকিৎসকের পরীক্ষালব্ধ তথ্য দিয়ে প্রেসক্রিপশনের পাতা না ভরিয়ে সেই স্পর্শকাতর ও গোপনীয় তথ্য অন্যত্র লিপিবদ্ধ করলে ভালো হয়। বরং প্রেসক্রিপশনে থাকা উচিত চিকিৎসক যে রোগের ওষুধ দিচ্ছেন সেই রোগের নাম। এইখানে অনেক সময় চিকিৎসককে অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের অনুমানের ভিত্তিতে নিদান দিতে হয়। সেই সব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রোগের নামসমূহ উল্লেখ করলে চলে। স্পষ্ট ও পাঠযোগ্যভাবে নিশ্চিত অথবা সম্ভাব্য রোগের নাম লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন যাতে করে ঐ একই অথবা অন্য কোনো চিকিৎসক পরবর্তী কোনও সময় আগেকার রোগের বিবরণ অনুধাবন করতে পারেন। উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি নিরাময়ের অযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন খুবই দরকারি। আবার রিউম্যাটিক ফিভার, টাইফয়েড, আন্ত্রিকের মতো বেশকিছু রোগ কখনও কখনও দীর্ঘ সময় পরে

অন্যরূপে প্রকাশিত হয়। সেই সব ক্ষেত্রেও আগেকার রোগের সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মূল্যবান। উন্নত দেশগুলিতে সঠিক ভাবেই রোগীর হাতে কেবল ওষুধের ফর্দ দিয়ে রোগের বিবরণ অন্যত্র সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি আছে। আমাদের দেশে যেহেতু নির্ভরযোগ্যভাবে চিকিৎসা বিষয়ক নথি সংরক্ষণের উপায় ও সেই নথি প্রয়োজনমতো পুনরুদ্ধারের উপায় নেই, তাই এই দায়িত্বটা রোগীকেই নিতে হয়। চিকিৎসকের দায়িত্ব হল পড়ে বোঝা যায় এমনভাবে, তথ্যসমূহ রোগীর হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিয়ে দেওয়া। খুব ভালো হয় যদি, প্রেসক্রিপশনের দুটো অংশ থাকে, এক অংশে থাকবে তারিখ ও রোগের সুস্পষ্ট, পাঠযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ রোগের সুসংবদ্ধ বিবরণ (কেবল রুগীর কষ্টের তালিকা নয়) ও তৎসম্পর্কিত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল। অপর অংশে থাকবে ওষুধের নাম, পরিমাণ ও প্রয়োগবিধি। পরের অংশটি রোগীর মাতৃভাষায়, সাংকেতিক চিহ্ন পরিহার করে লেখা উচিত। প্রথম অংশটি গোপনীয় ও ব্যক্তিগত, ওষুধের দোকানে দেখানো বাধ্যতামূলক নয়।

এ তো গেল ছোটখাটো ডাক্তারের চেম্বারের বা হাসপাতালের বহির্বিভাগের কথা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রুগীর ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব সমস্যা গুরুতর ও চিকিৎসক যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন রোগনির্ণয়ের জন্য। হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়া পায় দু'ভাবে। হয় মারা যায় অথবা সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরে। প্রথম ক্ষেত্র পায় ডেথ সার্টিফিকেট ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাতে পায় ডিস্‌চার্জ সার্টিফিকেট অথবা সামারি। ডিস্‌চার্জ সামারি প্রায়শই হাসপাতালের বিল, ওষুধের বিল, হরেক রকম চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষার রিপোর্টের ভিড়ে হারিয়ে যায় অথবা চিকিৎসাবিমার দপ্তরে জমা পড়ে যায়। ডিস্‌চার্জ সামারি এমনই একটা নথি যেটা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর বহুদিন পর্যন্ত কাজে লাগে। সঠিকভাবে প্রস্তুত ডিস্‌চার্জ সামারিতে

রোগীর নাম, বয়স,ঠিকানা ইত্যাদির সঙ্গে ভর্তির ও ছুটি হবার তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। ছুটি হবার সময় অন্তিমভাবে নির্ণীত রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্মত নাম বা নামসমূহের (কোড নম্বর সহ) উল্লেখ থাকে। আরও থাকে ভর্তির সময় রোগীর রোগের লক্ষণ ও ভর্তি হবার কারণ। হাসপাতালে ভর্তি হবার উপযুক্ত কারণ লেখা থাকাটা জরুরি, যেহেতু যে কোনো রোগর লক্ষণই হাসপাতালে ভর্তির কারণ হতে পারে না। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় তারিখ সহ বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল থাকবে। ডিস্‌চার্জ সামারির সবচেয়ে অবহেলিত অংশ হল ভর্তি থাকা অবস্থায় চিকিৎসার সংক্ষেপিত বিবরণ। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক, আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেও হাসপাতালে থাকা অবস্থায় চিকিৎসা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করাটা কেন জরুরি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ধমনীর মধ্যে জমাট বাঁধা রক্ত সাফ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির মধ্যে বিশেষ কিছু ওষুধ (থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি) ব্যবহার করা অথবা না করার উপর আপৎকালীন চিকিৎসার পরবর্তী সময়ে রুগীর হৃদযন্ত্রের সুস্থতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব স্পন্দনক্ষমতা হ্রাস পেলে ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রনিক পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রতিস্থাপিত পেসমেকারের আয়ু ও সফলভাবে কর্মক্ষমতা নির্ভর করে পেসমেকারের ধরন, মডেল ও প্রতিস্থাপনের সময়ে পরিলক্ষিত হৃদপেশীর সংবেদনশীলতা, ইলেকট্রিকাল সার্কিটের রেজিস্টান্স ইত্যাদির ওপর। এই তথ্যগুলো রুগী ও রুগীর পরিজনের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলেও ডিস্‌চার্জ সামারিতে ভর্তি থাকা অবস্থায় চিকিৎসার সংক্ষেপিত বিবরণের উল্লেখ আছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত। ওষুধের নাম, মাত্রা, প্রয়োগবিধি ও চিকিৎসার স্থায়িত্বকাল (duration) ও পরবর্তী পদক্ষেপ স্পষ্টভাষায় লেখা থাকতে হবে।

চিকিৎসকদের সাংকেতিক ভাষা

আচ্ছা বলুন তো, hs, tdac, q6h, stat, TCA ইত্যাদি সাংকেতিক শব্দগুলোর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? এর মধ্যে প্রথম চারটি ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়া অজস্র অবাঞ্ছিত কুঅভ্যাসে ব্যবহৃত শব্দ। এগুলো সব লাতিন শব্দের সংক্ষেপ। নেটিভ ভারতবাসীদের ডাক্তারি শেখানোর সময় তাদের নিজেদের কাছে সহজবোধ্য তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতিগুলো তারা ব্যবহার করত। ডাক্তাররা নিজের বুদ্ধিকে মগডালে তুলে রেখে ঐ সাংকেতিক শব্দগুলো ব্যবহারের মোহ ছাড়তে পারে নি। চতুর্থটি অবশ্য দেশী সাহেবদের তৈরি, যার অর্থ To Come After। চিকিৎসকদের মধ্যে নিজেদের যোগাযোগের ভাষা হলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু প্রেসক্রিপশন যখন চিকিৎসকের দীর্ঘ খাটাখাটুনি ও চিন্তার এবং রুগীর কষ্টকর অপেক্ষা ও অর্থব্যয়ের ফসল, সেটার জন্য আর একটু যত্নবান হওয়া দরকার নয় কি?

সংক্ষেপিত শব্দ পরিহার করা উচিত

একই ছাদের নীচে দুজন ভিন্ন শাখার চিকিৎসক অবস্থান করলেও, বিভিন্ন চিকিৎসা বিভাগের পরিষেবার প্রয়োজন আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদানের প্রথা আমলাতান্ত্রিক রোগে দুষ্ট। অর্থাৎ ভরসা সেই প্রেসক্রিপশন। যদি কোনো রুগীর চোখের অসুখের সঙ্গে হৃদরোগও থাকে, চক্ষুবিশারদের প্রেসক্রিপশনের সাংকেতিক ভাষা (IOL LE) হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বুঝতে পারলেন না, রুগীকে জিজ্ঞাসা করে অনুমানে বুঝলেন যে বাম চোখে ছানি কাটানোর অপারেশন করা হবে। এবার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ খসখস করে লিখলেন 'CAD, TVD, Recent ACS, LVEF 32%, CKD, ↓Na, ↑k; high risk case'। এর অর্থ চক্ষুবিশারদ সব সময় না বুঝলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি লেখা হত, Coronary artery disease, Tripple vessel disease, Recent acute coronary syndrome, Cardiac failure with LV ejection fraction 32%, Chronic kidney disease, Decreased serum sodium and increased serum potassium, তবে সেটা তাঁর বুঝতে সুবিধা হত। বিভিন্ন শাখায় ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখা কোনো একটি শাখার বিশেষজ্ঞেরই পক্ষে সম্ভব নয়। তাই চিকিৎসকদের নিজের পেশার গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের সময়ও সংক্ষেপ পরিহারযোগ্য।

প্রেসক্রিপশনের অপ্রয়োজনীয় অংশ

যদিও হাস্যকর, অল্প হলেও কোনো কোনো প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসকদের উল্লেখ করতে দেখা যায়, 'Complimentary', 'Not valid for medico-legal purpose', 'Don't substitute'। এই উক্তিগুলো কোন উদ্দেশে লেখা হয়ে থাকে? Complimentary বলতে মহানুভব চিকিৎসক এটা স্পষ্ট করে বিজ্ঞাপিত করতে চান যে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পরিষেবা প্রদান করছেন। এই বিজ্ঞাপনটা যে কেন প্রেসক্রিপশনে লিখতে হবে সেটা বোঝা মুশকিল। ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ এই বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয় না। তেমনই বিচার বিভাগ কুচিকিৎসা বিষয়ক বিচারের ক্ষেত্রে 'Not valid for medico-legal purpose' এর বর্মকে তোয়াক্কা করে না। অনেক সময় চিকিৎসক চাইছেন, তাঁর উল্লিখিত ওষুধের বিকল্প ওষুধ যেন ব্যবহৃত না হয়, সেই ক্ষেত্রে 'Don't substitute' লেখা হয়ে থাকে। এটা হয়তো অনেক সময় কাম্য, যদিও সরকারি আশ্রয়, উদ্যোগ ও সমর্থনপুষ্ট ওষুধের দোকানগুলিতে এই ইচ্ছের কতটা মর্যাদা দেওয়া হয় তাতে সংশয় আছে। এছাড়া কখনও কখনও প্রেসক্রিপশনে দেখা যায় চিকিৎসকের নিজস্ব বিশ্বাস ও রুচি অনুযায়ী দেবদেবীদের নাম অথবা তৎসম্পর্কিত সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার অথবা 'আমি চিকিৎসা করি, ভগবান রোগ সারান' এই ধরনের প্রবচনের উল্লেখ। অর্থাৎ রোগ সেরে গেলে চিকিৎসকের কৃতিত্ব, অন্যথায় ভগবানের অভিশাপ। চিকিৎসকদের এই ধরনের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশের জন্য প্রেসক্রিপশনকে ছাড় দিয়ে অন্য কিছু ভাবা যায় না? চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় এর অনুমোদন নেই।

ডাক্তারদের প্রিয় কিছু সাংকেতিক ভাষার প্রতিশব্দ

ওষুধের প্রয়োগবিধি সংকেতে লেখার সময় ঐতিহাসিক কারণে লাতিন শব্দের (যেমনটি প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে) সংকেত লেখা হয়ে আসছে। এটা না জানা থাকলে কেউ যদি মনে করেন যে, OD মানে over dose, BD মানে behavioral disorder আর TCPC মানে therapeutic discovery credit (established under section 48D, The affordable care act of 2010) তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আবার দিনে একবার এর বদলে 'qd (লাতিন quaque die, daily বা 'every day' এর সংক্ষেপিত লাতিন কথা)' লিখলে ভুল করে কেউ qid দিনে চারবার (লাতিন quater in die) অথবা od, ডান চোখের ওষুধ (লাতিন oculus dexter) মনে করতে পারে। অতি ব্যস্ত ডাক্তারের কলমে q আর o এর নিশ্চিতভাবে ফারাক করা অনেক সময় মুস্কিল হয়।

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি চিকিৎসকদের সাংকেতিক ভাষা

সংকেত ভাষা	উৎস ল্যাটিন	বাংলা প্রতিশব্দ
od	omne die	দিনে একবার
od	oculus dexter	ডান চোখে প্রয়োগের জন্য
os	oculus sisnister	বাম চোখে প্রয়োগের জন্য
bid	bis in die or bis in sumendus	দিনে দু'বার
tds	ter die sumendus	দিনে তিনবার
qd	quaque die	প্রতিদিনের জন্য
qid	quater in die	দিনে চারবার
ac	anti cibum	খাবার আগে
pc	post cibum	খাবার পরে
hs	Hora somni	রাতে শোবার আগে
prn	pro re nata	আগে বলে দেওয়া বিশেষ অবস্থায় ব্যবহারের জন্য
sos	এটি একটি অপব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষা। এই ক্ষেত্রে prn প্রযোজ্য	
cm	cras mane	পরদিন সকালে
po	per os	খাবার ওষুধ
q 3 h	quaque 3 hora	প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর
stat	statim	এখনই প্রয়োগ করতে হবে

ক্ষুদ্রকায় দশমিক ও অন্যান্য বিভ্রাট :

সুস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন লেখার জন্য ওষুধের মাত্রা লেখার সময় ১) দশমিকের পরে অবাঞ্ছিত শূন্য বর্জনীয়। ৫.০ মিলিকে ভুল করে ৫০ মনে হতে পারে।

২) একক মাত্রার চেয়ে কম হলে অর্থাৎ কেবল দশমিকের পরে সংখ্যা থাকলে দশমিকের আগে শূন্যের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। নতুবা .৫-কে ভুল করে ৫ মনে হতে পারে।

৩) দশমিকের পরের সংখ্যায় শেষের শূন্য বর্জনীয়। ০.৫০-এর চেয়ে ০.৫ বেশি স্পষ্ট। না হলে ০.৫০ কে সঠিক ভাবে ০.৫ কেউ না ভাবতেও পারে।

৪) তরল ওষুধের মাত্রা 'cc' or 'cm^3' না লিখে 'mL' লেখা ভাল। কারণ প্রেসক্রিপশন অঙ্কের বাহাদুরি দেখানোর জায়গা নয়। 'c.c' এই সংকেতটি আবার খাবার সাথে গ্রহন করুন (take with meals ল্যাটিন *cum cibo*) ভাবা যেতে পারে।

৫) যেখানে সম্ভব, দিনে তিন বার উল্লেখ করার চেয়ে, সময় উল্লেখ করে (7 am, 3 pm, 11 pm) ও খাবার আগে অথবা পরে বলে দেওয়া ভাল।

৬) তরল ওষুধের ক্ষেত্রে, চা চামচের মাত্রায় না লিখে ৫ মিলিলিটার (mL) লিখলে বেশি স্পষ্ট হয়।

৭) সংখ্যার পাশাপাশি কথায় লিখলে আরও ভ্রান্তি দূর করা যায়, যেমনটি ব্যাঙ্কের চেকে লিখতে আমরা অভ্যস্ত।

৮) লুপ্তপ্রায় apothecary মাত্রার একক এখন প্রায় ব্যবহার

হয় না। যেমন pints (O), ounces, drams, scruples, grains (gr), and minims। Pints কে শূন্য, grains (gr) কে গ্রাম, minims কে 'm' (micrograms or metres), drams (3) কে ৩ মনে হতে পারে। পুরনো বিভ্রান্তিকর একক ছেড়ে সর্বজনগ্রাহ্য মেট্রিক পদ্ধতির ব্যবহার শ্রেয়।

৯) ডিগ্রির সংকেত চিহ্ন হিসাবে (°) এর ব্যবহার আর এক বিভ্রান্তির কারণ। প্রেসক্রিপশনে ডিগ্রির সংকেত চিহ্ন সাধারণত ঘণ্টা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'q2-4^0' এর অর্থ প্রতি ২ থেকে ৪ ঘণ্টা অন্তর। ডিগ্রির সংকেত চিহ্নকে ভুল করে শূন্য মনে হওয়াটা খুব দোষের নয়। যদি কেউ primary, secondary and tertiary বদলে 1^0, 2^0 and 3^0 লেখেন, ভুল করে সেগুলোকে যথাক্রমে ১০, ২০ ও ৩০ মনে হতে পারে।

সুখপাঠ্য লেখার সাধারণ নিয়ম

অপরিকল্পিতভাবে পাতা ভরা লেখার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা সময়সাধ্য ও চোখের পক্ষে ক্লান্তিকর। তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, কাগজের কোথায়, কী লিখতে হবে। এর জন্য প্রথমে কিছু পরিকল্পনা মাফিক অনুশীলন করলে ক্রমে সেটা অভ্যাসে পরিণত হবে। শব্দগুলো প্রতিটা অক্ষরকে সমমর্যাদা দিয়ে শব্দের শেষের অক্ষরগুলোকেও সমান মাপে (ফন্ট) লিখতে পারা চাই। লেখার পাতার তলার দিকে আরও কিছু লেখা বাকি থাকলে সব তথ্যকে ঠাঁই দেবার জন্য হয় লেখার মাপ ছোট হয়ে যায় অথবা পৃষ্ঠার উপরের দিকে ফাঁকা জায়গা খুঁজে সেখানে লেখার ইচ্ছে হয়। এইরকম লেখার কুঅভ্যাস আছে বেশ কিছু ডাক্তারের। এই অভ্যাস পাল্টানো দরকার। মনে রাখা জরুরি, প্রেসক্রিপশন একাধিক পাঠককে সঠিকভাবে পড়ে রোগ নিরাময় নামক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভাগীদার হতে হবে।

আরও অস্পষ্টতা আছে

অনেক রোগীই কিছু ওষুধ খাওয়াকালীন চিকিৎসকের কাছে আসেন পরামর্শ নেবার জন্য। তাঁদের স্পষ্ট করে লিখে ও বলে দেওয়া প্রয়োজন আগেকার চালু ওষুধগুলো থাকবে কিনা।

খেয়াল করবেন, কাছাকাছি নামের একাধিক ওষুধ পাওয়া যায়। তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র ও শরীরের উপর ক্রিয়া ভিন্ন। তাড়াহুড়ো করে লেখা অস্পষ্ট ও পাঠের অযোগ্য প্রেসক্রিপশন ওষুধ দেখে ওষুধ দেবার সময়, ওষুধ বিক্রেতার ভুল হলে তাঁকে দেওয়া যায় না। যেমন ধরুন, হৃদরোগের দুটো ওষুধ 'আইসপটিন' ও 'আইসোপ্রিন'-এর প্রথমটায় হৃদস্পন্দন কমে ও দ্বিতীয়টিতে বাড়ে। আপনার হয়তো হৃদস্পন্দন কমানো দরকার, চিকিৎসকের হাতে লেখা আইসপটিন-কে আইসপ্রিন ভেবে ওষুধ দিলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা। ওষুধের নাম হাতে লিখে দিলে ছোট হাতের পেঁচানো হরফের বদলে বড় হাতের হরফে হওয়া উচিত।

যে ওষুধ প্রয়োগবিধি বিসেবে পি আর এন বা এস ও এস লেখা থাকে, অর্থাৎ চিকিৎসক চাইছেন কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহৃত হোক, সে ক্ষেত্রে উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন, যে ওষুধটি কোন ক্ষেত্রে, কত মাত্রায়, কত বার ও কত সময় অন্তর ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের শৈশবে দেখেছি ডাক্তারবাবুরা রুগী দেখে ওষুধের পুরিয়া, মলম অথবা শিশিতে কাগজের নিশানা দিয়ে হাল্কা লাল রঙের মিক্সচার দিতেন। তিনি আলাদা করে প্রেসক্রিপশন দিতেন না আর ওষুধের দোকানেও যেতে হত না। এখন চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত। ডাক্তারবাবুদের আর ওষুধ তৈরি করার মতো অল্প পারদর্শিতার কাজ করতে হয় না। একবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসকের জ্ঞান, বুদ্ধি আর পরিশ্রমের ফসল কেবল এক পাতা কাগজ। সেই কাগজটি শক্তিশালী, নিখুঁত ও কার্যকরী হওয়া চাই।

উমা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ভ্রম সংশোধন

১০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে— পেশীর টোন অথবা পেশীর অন্তর্নিহিত টান না বাড়িয়ে এই ব্যায়াম করা হয় বলে এমন নাম (iso, আইসো=সমান, tone,টোন=মাপ)। ওখানে পড়তে 'টোন=টান' পড়তে হবে। ১২ পৃষ্ঠায় ছিল: 'এর ফলে হৃৎপিণ্ডকে কম কাজ (decreased myocardial oxygen demand) করতে হয় ও সরু হয়ে হয়ে যাওয়া রক্তনালী দিয়ে কম রক্ত হৃৎপিণ্ডে সরবরাহ হয় তাতে সেই কাজ করাটা সহজ হয়।' ওখানে 'কম'-এর আগে 'যে' শব্দটি বাদ গেছে। ১৪ পৃষ্ঠা: "১"= সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতায় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতি= ২২০ বয়স (বৎসরে) {মহিলাদের ক্ষেত্রে ২২৬ (বৎসরে)} ছাপা হয়েছে। ওখানে ২২০ ও ২২৬-এর পর ড্যাশ দিয়ে বয়স (বৎসরে) বসবে।

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈতরী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

আমাদের হতভাগীরা

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

কিছুদিন আগে (নভেম্বর ৬-৮, ২০১৩) কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরাজি দৈনিকে তিন দিনে মোট ৫টি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল। বিষয় একটিই — দিল্লীতে এক ৩৫ বছর বয়স্ক পরিচারিকার মাথায়, বুকে, পেটে, হাতে গুরুতর আঘাত নিয়ে মৃত্যু।

লোকসভার এক সদস্যের দন্ত চিকিৎসক স্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের এই কাজের মেয়েকে নৃশংস অত্যাচার করে হত্যা করার অভিযোগে। তাঁর স্বামী, সাংসদ, গ্রেপ্তার হয়েছেন সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করার অভিযোগে। দুজনের বিরুদ্ধে এক নাবালককে ভৃত্য হিসেবে নিয়োগ করার অভিযোগও রয়েছে। হাসপাতালে গুরুতর আহত চিকিৎসাধীন সে বাড়ির ৪৩ বছর বয়স্কা অন্য একটি পরিচারিকাও। অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগের কারণে বিচারক তাঁদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর : আদালতে উপস্থিত দুজনের কারুরই চোখেমুখে অনুতাপের চিহ্নমাত্র ছিল না। বলতে দ্বিধা নেই, পুরো খবরটা আমি খুঁটিয়ে পড়লাম মেয়ে দুটি বাঙালি বলেই। নয়তো হত্যা তো অহরহ কতই ঘটে যাচ্ছে!

বিংশতি নয়ন

আদালতে পুলিশের বয়ান ও সাক্ষীদের বক্তব্য থেকে পুরো ঘটনার একটা ছবি ফুটে উঠেছে।

ও বাড়িতে সর্বক্ষণের কাজের লোক ছিল তিনটি : মৃতা মেয়েটি, আরেকটি মহিলা ও এক নাবালক ভৃত্য। গৃহকর্ত্রী তুচ্ছতম কারণে এদের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করতেন। গরম লোহার ছেঁকা দিতেন, ওঁর একটা কাঠের তৈরি হরিণের শিঙের নকল দেয়ালে টাঙানো থাকতো। সেটা দিয়ে খোঁচাতেন। ওদের তালা দিয়ে রাখা হত, ভয় দেখানো হত, বাড়ি থেকে বেরোলেই রক্ষীরা ওদের গুলি করবে।

সে বাড়ির সর্বত্র, এমনকি স্নানের ঘরেও, ২০টি সিসিটিভি লাগানো, যেগুলোর ছবি আই-ফোনে দেখে বাতিকগ্রস্ত গৃহকর্ত্রী এদের ওপর নজর রাখতেন।

ঘটনার দিন গৃহকর্ত্রী তিনজনের ওপরেই অত্যাচার শুরু করেন। গরম লোহার ছেঁকা দেন, লাথি ও ঘুষি মারতে থাকেন। এরকম লাথির ধাক্কায় মেয়েটি একটা দরজার ওপর আছড়ে পড়ে, তার মাথাটা দরজার হাতলে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়, মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার দেখানো বা হাসপাতালে পাঠানোর বদলে তার ক্ষতগুলোতে মলম লাগিয়ে গৃহকর্ত্রী অপেক্ষা করতে থাকেন মেয়েটির কখন জ্ঞান ফিরবে। ভৃত্যটিকে বলেন, ওকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, যেন বিরক্ত না করা হয়।

সে রাতেই মেয়েটি মারা যায়। গৃহকর্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে অনুপস্থিত স্বামীকে ফোন করে বলেন কী ঘটেছে। পরদিন গৃহকর্তা ফিরে এসেই প্রথমে সিসিটিভি-র ছবিগুলোর অংশবিশেষ নষ্ট করেন। দ্বিতীয় পরিচারিকাটি তখন পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণায় কাঁদছিল বলে এক আত্মীয়ের বাড়ি সরিয়ে দেন। তারপর নিকটবর্তী থানায় গিয়ে বলেন, একটি মেয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ দেহটি 'মৃত অবস্থায় আনীত' বলে ঘোষণা করেন। দেহটির সর্বত্র পোড়ার চিহ্ন আর বুকে, পেটে, হাতে, পায়ে ছিল ক্ষত।পুলিশের কাছে গৃহকর্ত্রী মারধোরের কথা অবশ্য অস্বীকার করেন নি তবে বলেছিলেন তিনি নাকি নাবালক ছেলেটি ও মধ্যবয়স্কা (২০ বছরের পুত্রের মা) মৃতাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে দুজনকে শাস্তি দিচ্ছিলেন।

তবে এ মেয়েটি একা নয়। পত্রিকাটির দিল্লীস্থ প্রতিনিধি একটি প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন, এই মৃত্যুটি রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টার গৃহভৃত্যদের ওপর শিক্ষিত, ধনী নিয়োগকর্তাদের নৃসংশতা ও দুর্ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার একটি নিদর্শন মাত্র। এও জানিয়েছেন যে, রেজিস্ট্রিকৃত 'প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ' সংস্থাগুলোর হিসেব অনুযায়ী যে কোনো সময় দিল্লী (ও গুরগাঁওয়ে) ৭০,০০০ পরিবার গৃহভৃত্যের সন্ধান করে থাকেন।

প্রতিবেদক এরপর কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। গত অক্টোবরের ১লা তারিখেই একটি ফরাসি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদাধিকারী এক মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছেন নাবালিকা পরিচারিকাকে অত্যাচার করার জন্য। অভিযোগ, কিশোরীটিকে ঝাঁটা দিয়ে পেটানো হত, ছুরি দিয়ে খোঁচানো হত, অর্ধনগ্ন করে রাখা হত, যাতে সে পালাতে না পারে। বাড়ি যাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হত না, এক পয়সাও বেতন

দেওয়া হত না। গত বছর এক ডাক্তার দম্পতিকে আদালতে যেতে হয়েছিল তাদের ১৩ বছরের পরিচারিকাকে তালা দিয়ে রেখে শ্যামদেশে বেড়াতে যাওয়ায়। ২০১১ সালে একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী নাবালিকা পরিচারিকাকে তালা দিয়ে সপরিবার একটি বাণিজ্য মেলায় গিয়েছিল। সে বছরই এক শিল্পপতি এক বছরের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, 'নোকরানি'কে দৈনিক খরচের জন্য ২০ টাকা দিয়ে। বর্তমান ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহকর্ত্রী একজন দন্তচিকিৎসক ও দিল্লির একটি নামকরা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তবে গৃহকর্তাটি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবু উল্লেখ করা হচ্ছে আমাদের রাজনীতির বীভৎস চেহারার একটি উদাহরণ হিসেবে। পত্রিকাটির একটি প্রতিবেদন পুরোটাই এই গুণধরকে নিয়ে।

এ যুগের ধনঞ্জয়

উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের একটি কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত সাংসদ। এঁর বিরুদ্ধে ২২টি অপরাধের জন্য মামলা ঝুলছে এবং শোনা যায় উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর পরিচালিত গুণ্ডা বাহিনী রয়েছে। ১৯৯৮-এর শুরুতেই উত্তর প্রদেশ পুলিশ এই ব্যক্তিকে ১২টি খুন ও ডাকাতির জন্য 'ভয়ঙ্কর অপরাধী' বলে খুঁজছিল। তাকে ধরতে পারলে তখন ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ছিল। সে বছরেরই অক্টোবরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি রিপোর্টে পুলিশ জানায় যে সঙ্ঘর্ষে মৃত চারজনের একটি দলে এ ব্যক্তিও ছিল। (কমিশন অবশ্য 'সঙ্ঘর্ষ' সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। তাই নিরপেক্ষ তদন্ত করায়। সঙ্ঘর্ষটি ভুয়ো প্রমাণ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার আদেশ দেন)। চার মাস বাদেই, ১৯৯৯ ফেব্রুয়ারিতে এ ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দেখলেন পরিস্থিতি অনকূল। অন্যান্য সব গুণ্ডাবাহিনী হয় ভেঙে গেছে নয় পালিয়েছে, তিনিই এক বিস্তৃত অঞ্চলের অপরাধজগতের সর্বেসর্বা হয়ে গেলেন।

২০০২ সালে তিনি এক নির্দল বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৩-০৬ সালে তিনি তৎকালীন শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ২০০৭ সালে পালাবদল হওয়ায় তিনি পরিবর্তিত শাসক দলে যোগ দেন ও সে দলের আর বর্ণের জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। প্রতিপক্ষের মতে অবশ্য তিনি শাসকদলের 'রাজা ভাইয়া' হয়ে উঠলেন। ২০০৯ সালে তিনি সেই দলেরই সাংসদ হলেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুরহস্য নিয়ে। ২০১০ সালে যখন সে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ৫০০০ কোটি টাকার তছরূপ ফাঁস হয় তখন সে সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সংবাদ শিরোনাম হয়ে ওঠে। তিনি গ্রেপ্তার হন, পরে মুক্তও হন।

২০১১ সালে একটি জোড়া খুনের ঘটনায় এবং বিপক্ষ দলের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের কারণে দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত হন আর সে বছরই পুনর্বহাল হন।

এ বছরেরই জানুয়ারি মাসে যখন তাঁর সহযোগী খুন হন তখন প্রাথমিক বিবরণে (এফ আই আর) তাঁর নামের উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি গ্রেপ্তার হন নি।

বাংলায় জন্ম, দিল্লীতে পণ্য

পত্রিকাটি স্থানীয় পুলিশ, সরকারি আধিকারিক আর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের প্রশ্ন করে জানতে পেরেছে, বাংলা থেকে অবৈধভাবে চালান হওয়া ৫৫,০০০ মহিলা ও বালিকা পরিচারিকা হিসেবে দিল্লিতে কর্মরত।

রাজধানীতে ২০০০ বেআইনি নিয়োজক সংস্থা রয়েছে। এদের ভাড়া করা দালালরা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে গিয়ে উঠতি বয়সের মেয়েদের একটা উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দেখায় এমন উপার্জনের যাতে তারা বাড়িতেও টাকা পাঠাতে পারবে। এই মেয়েদের নিয়ে এসে এরা এদের অধিকাংশকে 'বন্দী শ্রমিক' (বন্ডেড লেবার) হিসেবে ধনী পরিবারে বিক্রি করে দেয়। যেখানে ওদের বিনা পারিশ্রমিকে অকল্পনীয় সময় ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে যেতে হয় শুধু দুবেলা খাওয়ার বিনিময়ে। নিয়োগকর্তারা প্রায়ই তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেন, এমনকি ধর্ষণও।

এ মেয়েদের অর্ধেকের বেশি নাবালিকা, অনেকের বয়স ১০-এরও কম। যদিও চাহিদা সবচেয়ে বেশি ১০ থেকে ১৫ বছরের মেয়েদের। কোনো কোনো মেয়েকে পুলিশ বা কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উদ্ধার করতে পারে, কেউ কেউ পালাতেও পারে। কিন্তু অধিকাংশই সারাজীবন ক্রীতদাস থাকার বিকল্প পায় না।

শিশুশ্রম নিরোধে কাজ করছেন এমন একটি সংগঠনের মতে দিল্লী হয়ে উঠেছে শিশু পাচারের কেন্দ্রবিন্দু। এই অভিযোগও রয়েছে যে এই বেআইনি সংস্থাগুলো নিয়মিত স্থানীয় থানায় ঘুষ দিয়ে থাকে।

পুলিশ জানতে পেরেছে, এই মৃতা মেয়েটিকে দক্ষিণ দিল্লির একটি নিয়োজক সংস্থা সাংসদের কাছে 'বিক্রি' করেছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায়। তাকে কোনো বেতন দেওয়া হত না, দুবেলা দুমুঠো খেতে দেওয়া হত শুধু। অন্য যে মেয়েটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাকেও একই সংস্থা সাংসদের কাছে বিক্রি করেছিল, তবে কি মূল্যে জানা নেই।

এ পর্যন্ত যাঁরা পড়বেন তাদের অনেকেই বলবেন 'এ আর নতুন কথা কী?' বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে বহুদিন ধরেই ত' মেয়েদের ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন শহরের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে তাদের অবর্ণনীয় দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে। আমাকেও হয়তো এ সংবাদ তেমনভাবে নাড়া দিত না যদি না

আমার বড় মেয়ে কিছুদিনের জন্য এসে পড়তো। সে কোয়েম্বাটুরে একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত যাদের সেখানে বিপুল ভূসম্পত্তি। যে ভূসম্পত্তির পরিচর্যা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কায়িক শ্রমের জন্য যারা নিযুক্ত তারা সবাই বাঙালি। (তারা সপরিবারে কোয়েম্বাটুরেই থাকে)। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'স্থানীয় লোক নয় কেন?' মেয়ে বললো 'আমরা সরকার নির্ধারিত যে পারিশ্রমিক দিই তাতে ওখানে এ সব কাজ করার লোক পাওয়া যায় না'। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন?' সে বললো 'কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের (যথা NREGA ইত্যাদি) কল্যাণে ওখানকার লোকের দারিদ্র্য অনেকটাই ঘুচেছে।'

সেই থেকে আমি অবাক হয়ে ভাবছি বাংলার গরিবরা এসব কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত কেন? নিশ্চয়ই এগুলো সম্বন্ধে এদের অজ্ঞতা? কত নামই ত' শুনতে পাই, যেমন ১০০ দিনের কাজ, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা ইত্যাদি। ওগুলোর কোনোটাই ত শুধু তামিলনাড়ুর জন্য নয়! একথা অনস্বীকার্য যে সমস্যাটা মূলত দারিদ্রের আর বর্তমান বাংলার থেকে তামিলনাড়ু অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু এসব অনুদান ত মূলত কেন্দ্রীয় কোষ থেকে আসে। তবে কেন বাংলার কোনো প্রাদেশিক সরকারই এ সবের সুফল যাতে দরিদ্রতম স্তরে পৌঁছনয় সচেষ্ট হননি? কেন তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের সদিচ্ছা শুধু বক্তৃতার স্তরে রয়ে যাচ্ছে? চাকুরিজীবী বাঙালির কর্মবিমুখতা?

আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোই বা এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেন না কেন? বাংলায় রাজনীতি সর্বগ্রাসী বটে তবু সবাই যে তুচ্ছ রাজনীতি নিয়ে মেতে আছেন তা ত' নয়! বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, এইডস্ নিবারণ, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি কত কাজেই ত কত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ব্যস্ত আছেন। তাছাড়া আর্তদের সেবার জন্য কত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও ত' আছে। কেউ কেন এই মানুষগুলোকে তাদের প্রাপ্য সম্বন্ধে সচেতন করছেন না, সরকার নির্ধারিত প্রকল্পগুলোর সুফল যাতে তারা পায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হচ্ছেন না? সবাই কেন মুখ ফিরিয়ে?

বাংলার হতভাগীরা

আসলে আমরা বাঙালিরা চিরকালই আমাদের 'হতভাগী'দের প্রতি বড়ই নিষ্ঠুর। বারাণসী/বৃন্দাবনের আশ্রমে নির্বাসিতা বিধবারা প্রায় সবাই বাঙালি।। আর এই প্রতিবেদন অনুসারে দিল্লী/গুরগাঁওয়ারে ৭০ হাজার চাহিদার ৫৫ হাজার অর্থাৎ ৮০ শতাংশই মেটাচ্ছে বাঙালি মেয়েরা। সারা দেশের পতিতালয়গুলোয় খোঁজ নিলে, আশঙ্কা হয়, এরকম তথ্যই পাওয়া যাবে!

আমাদের লজ্জা কবে হবে?

উমা

প্রকৃতির প্রতিশোধ

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতার দেশ উন্নত হিমালয়
সেখানেই শেষে বিরাট বিপর্যয়,
মঠ-মন্দির ভেঙ্গেচুরে একাকার
আকাশে বাতাসে মানুষের হাহাকার!

রুষ্ট প্রকৃতি — কেউ ভাবে ঘোর কলি
ধর্ম মানুষ দিয়েছে জলাঞ্জলি,
প্রকৃতি রুষ্ট — একথাটা নির্ভুল
আসল কারণ ভুলে আছি বিলকুল।

পাহাড়ে তীর্থ — কেদার-বদ্রীনাথ
বয়ে যায় পাশে দুরন্ত নদীখাত,
অলকানন্দা গঙ্গা মন্দাকিনী
দুর্বার স্রোত পাহাড় নির্ঝরিণী।

ঘন ঘন বাঁধ এই নদীপথে দিয়ে
মানুষই তাদের রূপ দিল পাল্টিয়ে,
প্রকৃতিকে বেঁধে চাই জলবিদ্যুৎ
উন্নয়নে যা শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত।

ডায়নামাইটে চূর্ণ পাষাণভার
তৈরি সেখানে বড় বড় জলাধার
রুদ্ধ তটিনী লক্ গেটে হাঁসফাঁস
পঙ্গু প্রকৃতি ডাকল — 'সর্বনাশ'!

পরে নেমে এলে মেঘভাঙ্গা বর্ষণ
কিম্বা বরফ গলানো উষ্ণায়ণ
বিপুল জলের বেরবার নেই পথ
ভাঙ্গে লক্‌গেট দুর্বার জলরথ।

ছুটছে তখন ক্রুদ্ধ হড়কা বান
ধুয়ে মুছে সাফ হাজার লোকের প্রাণ,
প্রকৃতির রোষ দিল তার পরিচয়
শিখলাম কিছু, দেখে এ বিপর্যয়!

জিনিসের মূল্য বাড়ছে, কমছে বোধের !

সমীরকুমার ঘোষ

মূল্যবোধ। একে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? কেউ উপদেশ দেবেন, সংবাদপত্রে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' কলমে বিজ্ঞাপন দিন। নব্য যুবারা যৌবনের উচ্ছ্বাস দেখিয়ে বলবে— দাদা, এটা খায়, না মাথায় দেয়! কেউ মাথা চুলকে বলতে পারেন, কথাটা খুব চেনা চেনা ঠেকছে।

পরিবর্তন বা বদল সময়ের ধর্ম। কখনও কখনও এই বদল হয় খুব ধীরে। অনেক পরে হঠাৎ একদিন নজরে পড়ে। অনেক বদল হয় দ্রুত, আকস্মিক। গত দু-তিন দশকে মূল্যবোধের অবক্ষয় তেমনই চোখে পড়ার মতো। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। যখন কোনো প্রবীণ বলেন, 'আমাদের সময়ে এই ছিল, এখন সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে', তখন নবীনেরা প্রতিবাদ করে। বুঝিয়ে দেয়, প্রবীণেরা যাকে অবক্ষয় বলছেন, সেটা যুগধর্ম। ওঁরা মানিয়ে নিতে না পেরেই 'গেল গেল' রব তুলছেন। ঠাকুরদা ছেলেকে বলেন, তোদের প্রজন্ম গোল্লায় যাচ্ছে; সেই, মানে বাবা আবার তাঁর ছেলেকে বলেন একই কথা। দাদু থেকে নাতি, একই কথার ধারা। এর একটা মানে হতে পারে— ক্রমপতন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম হয়ে চলেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির মতো। জমানো টাকার মতো। কেউ বলতে পারেন, পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। অর্থাৎ এ নিয়ে অনন্ত তর্ক চলছে, চলবে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ বা রাজশেখর বসুর অভিধানে 'মূল্যবোধ' কথাটা পাওয়া যায় না। আমরা আদ্যিকাল থেকে নীতি-নৈতিকতা, সদ্‌গুণ ইত্যাদি শব্দ শুনে আসছি। মূল্যবোধ শব্দটা তৈরি হয়েছে ইংরেজি 'ভ্যালুজ'-এর অনুবাদ করে। মানে মূল্য সম্পর্কে বোধ। গোদা বাংলায় কিছু ভাল গুণ। এই ভাল ব্যাপারটা প্রজন্ম-নিরপেক্ষ। অনেকটা সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে-র মতো। অপত্যস্নেহ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন তো বটেই, অনাত্মীয় কেউ বিপদে পড়লেও তাকে সাহায্য করা, গুণী মানুষের কদর করা, শিশুদের ভালবাসা— সদ্ গুণের নমুনা। ইউনির্ভাসাল ট্রুথ-এর মতো চিরকালীন সত্য।

সুস্থ সাময়িক কাঠামোয় চোর-ডাকাত, খুনিদের হীন চোখে দেখা হয়। মূল্যবোধের আলোচনায় ওদের টানা উচিতই নয়। ভাবখানা এমন, ওদের আবার মূল্যবোধ কিসের! সে তো শিক্ষিত, রুচিশীলদের একচেটিয়া। কিন্তু মজার কথা হল, চোর, গুণ্ডা-বদমাসদেরও কিছু নীতি-ধর্ম ছিল। মূল্যবোধ ছিল। তাই সমাজের তথাকথিত এই খারাপ লোকেদের নিয়ে আলোচনা করলেই অবক্ষয়টা স্পষ্ট দেখতে পাব। নিকষ অন্ধকারেই বোঝা যায়, কতখানি আলোকহীন।

খুনিদের কথাই ধরুন। সে ভাড়াটে খুনি হোক বা স্বনিযুক্ত, ওদের মধ্যেও কতগুলো সদগুণ দেখতে পাওয়া যেত। যেমন, অতি বড় নিষ্ঠুর খুনিও কোনো ঘুমন্ত মানুষকে খুন করত না। এমনকি মনে করত, পিছন থেকে ছুরি মারাও কাপুরুষতার কাজ। এখন দেখুন, সাধারণ খুনিও অক্লেশে ঘুমন্ত লোককে খুন করছে। উদাহরণ হিসেবে সামনেই রয়েছেন ছত্তিশগড়ের শ্রমিকনেতা শঙ্কর গুহনিয়োগী।

যত দুর্ধর্ষ ডাকাতই হোক না কেন, কোনো বাড়িতে ডাকাতির সময় সিন্দুকের চাবি বা লুকনো টাকা-গয়নাগাঁটির হদিশ জানতে গৃহকর্তাকে টাঙ্গির কোপ বসাতে পারে, কিন্তু ভুলেও বাড়ির কোনো মহিলার গায়ে হাত দিত না। এখন ছিঁচকেগুলোও মহিলাদের কান থেকে দুল বা গলার হার টেনে ছিঁড়ে নিয়ে পালায়। স্বেচ্ছায় দিতে না চাইলে, চুড়ি-বালা সমেত হাত কেটে নিয়েছে, এমন নজিরও আছে। ফ্ল্যাটে থাকা অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তো লোভনীয় খাদ্য হয়ে উঠেছে। বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল হানাদাররা। অথচ বাংলার রঘু ডাকাত বা বিশে ডাকাতদের কথায় আসুন। দাপটে, সাহসে, মানবিকতায় ওঁরা কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। সম্পন্ন লোকেদের বাড়িতে ডাকাতির আগে চিঠি পাঠাতেন, যাতে গৃহকর্তা প্রতিরোধ করতে পারে। ডাকাতির টাকাপয়সা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলি করে দিতেন। এটা ওঁদের কাছে এক বীরত্ব ও সাহসিকতার খেলা ছিল। সেই সঙ্গে নৈতিকতারও। সেই জন্যই লোকে রঘু ডাকাতদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

চূর্ণী নদীর ঘাটে নৌকো ভিড়েছে। বরযাত্রীরা কেউ-ই নৌকো থেকে নামেনি। বরকর্তার কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে শাসানির সুর, 'আমার পণের সব টাকা না পেলে কোনো রকমেই বরকে নিয়ে আসব না।' বরকর্তার মুখে এমন কথা শুনে বাড়ির অবস্থা মুহূর্তে বদলে গিয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কাঁদতে শুরু করেছে। হঠাৎই সেখানে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তির আগমন ঘটল। পরিচয় দিল, 'আমি রঘু ডাকাত'। 'নৌকোর সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। কেউ আর কোনো দ্বিরুক্তি না

করিয়া কন্যার পিতার বাড়িতে চলিলেন। মনে' ভাবিলেন, সর্বনাশ! রঘু ডাকাত!'

সেকালের ডাকাতের মহানুভবতার এমন ছবিটি পাই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাত'-এ। ভূমিকায় যোগেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'গল্পগুলি বাংলা সরকারের সংবাদপত্র ও ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, কাল্পনিক কোনো গণ' নাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী'র ডাকাতসর্দার ভবানী পাঠকের কথা মনে করুন। জঙ্গলে অসহায়া রমণীকে পেয়েও তাঁর এতটুকু অমর্যাদা করেন নি। এঁরা মানবিক সম্পর্কগুলোকেও খুব মূল্য দিতেন। ভগবানচন্দ্র বসু ছেলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এক দাগি ডাকাতকে। যার কাঁধে চড়েই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বড় হয়েছিলেন। শিখেছিলেন জীবনের প্রাথমিক পাঠ। শরৎচন্দ্রের নয়ন ছাতির কথা মনে করুন। ডাকাতি ছেড়ে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গলে ঠগীরা যখন বৈষ্ণব ভিক্ষুকে পাবড়া ছুঁড়ে মেরে লুটপাট চালায়। নয়ন থাকতে পারেন না। অহিংসা ধর্ম ভুলে ওদের ধরে উত্তমমধ্যম দেন।

চোরদের আমরা সাধারণত তাচ্ছিল্য করি। কিন্তু সে সিঁধেলই হোক বা সাধারণ, ওরা গৃহস্থের বাড়ি চুরি করে ফাঁক করে দিলেও কপর্দকশূন্য করে দিত না। কিছু বাসনকোসন বা জামাকাপড় রেখে আসত। যাতে পরদিন গৃহস্থ বিপাকে না পড়ে।

যত বড় শত্রুই হোক না কেন, নিরস্ত্র কাউকে আঘাত করা বীরেদের কাছে অত্যন্ত অমর্যাদাকর ছিল। অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে হত্যা করা বা অর্জুনের কর্ণকে হত্যা করা— মহাভারতের যুগেও প্রশংসা পায়নি। এখন নিরস্ত্র কাউকে মারাটাই দস্তুর। মারি অরি পারি যে কৌশলে!

এখন ওঁদের গালভরা নাম যৌনকর্মী। আগে পতিতা বলত। নাম শুনেই বোঝা যায়, ওঁদের সামাজিক অবস্থান। এ হেন পতিতারাও সব মানুষকে নিজের খদ্দের হিসাবে দেখতেন না। কেউ ওঁদের বোন বা দিদি সম্বোধন করলে ওঁরা সেই সম্পর্কের এতটুকু অমর্যাদা করতেন না। এখনও অনেকে করেন না। 'সংসার সীমান্তে' ছবিতে এর খানিকটা তুলে ধরা হয়েছে।

কলকাতায় একসময় 'গুণ্ডা' নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। যাদের চেহারা হত ডাকাবুকো, মনে সাহস। আর ছিল বাজখাঁই গলা। তারা একাই অনেকের মহড়া নিতে পারত। লাঠি-ছুরি, সাইকেলের চেন, সোডার বোতল ছিল তাদের অস্ত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর বাড়বাড়ন্ত হতে শুরু করার পর, এরা কেউ কেউ নেতাদের হয়ে কাজ করতে শুরু করে। তবে ষাট-সত্তর দশকেও কলকাতা বা তার আশেপাশে এরা ব্যক্তিগত ক্যারিশমাতেই দাপিয়ে বেড়াত। এই সময়েই আমরা থাকতাম উত্তর কলকাতায়। নন্টিদা ছিলেন পাড়ার মস্তান। আমাদের ছোটবেলার হিরো। বামুনবাড়ির ছেলে। যে গলিতে থাকতেন সেটার নামই বামুনপাড়া। ফর্সা সুন্দর দেখতে। লেখাপড়া না শিখে বখে যান। যদিও বাড়ির অন্যরা শিক্ষিত, ভাল চাকুরে। মদ-গাঁজা খাওয়া, জুয়া খেলা, মারোয়াড়িদের কাছ থেকে তোলা আদায়, পাশের ডোমপাড়ার সঙ্গে বোমাবাজি— কিছুতেই ঘাটতি ছিল না। এ হেন নন্টিদাকে পাড়ার লোক ঘৃণা করত না। তার বড় কারণ উনি দু-একজন দোকানদার, ব্যবসায়ী ছাড়া পাড়ার কোনো লোকের ওপর অত্যাচার করতেন না। উল্টে গুরুজনদের সম্মান করতেন। পাড়ার মেয়ে-বৌদের দিকে মুখ তুলে তাঁকে চাইতেও কেউ দেখে নি। রাতে অনুষ্ঠান বাড়ি খেয়ে ফিরতে হয়ত রাত হয়ে গিয়েছে। পাড়া নিশুতি। তখন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা বাজলেই সবাই বাড়ি ঢুকে পড়ত। মেয়েরা নটার মধ্যে। আকণ্ঠ পান করে নন্টিদা স্যাঙাতদের নিয়ে শিবমন্দিরের রকে বসে। চলছে হুল্লোড়, গালিগালাজ। কাছাকাছি আসতেই বাবাকে দেখে চাপা স্বরে অন্যদের বললেন, দাদা আসছে। সবাই চুপ। ভাল মানুষের মতো মুখ করে বসে রইলেন। কখনও জিজ্ঞাসা করতেন, দাদার এত রাত হল! কিংবা একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে মাকে বললেন, বৌদি ভাল আছেন? কিশোর বয়সে যখন ডানা গজাচ্ছে। রাত করে পাড়ায় ঢুকলে নিস্তার ছিল না। কেন রাত হল ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে নন্টিদা বকাঝকাও করতেন। ফলে পুলিশ তাড়া করেছে নন্টিদাকে বাড়ির ভেতর লুকিয়ে ফেলা বা ছাদ টপকে পালাতে সাহায্য করতেও আমাদের বাধত না। ওঁরা ছিলেন পাড়ার অলিখিত অভিভাবক। বেপাড়ার কোনো ছেলের হিম্মত হত না পাড়ার মেয়ের পিছনে লাগার। লাগলে? তার জের গড়াত মারদাঙ্গায়। এমন গুণ্ডা-মাস্তান সব পাড়াতেই ছিল। নন্টিদা ছিলেন ছোট মাপের মস্তান। পাড়াই ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। একটু বড় মাপের মস্তানদের কথা বলি। যাঁদের গোটা শহর চিনত। যাঁদের বীরত্বের কথা নিয়ে তৈরি হত রূপকথা। মৌলালি ক্রিক রোয়ের ভানু বোস এবং বৌবাজারের গোপাল মুখুজ্জ্যে, যিনি গোপাল পাঁঠা নামে পরিচিত, ছিলেন এই দলে। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট মহম্মদ আলি জিন্নার 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' নীতিকে স্বীকার করে কলকাতায় 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে' ঘোষণা করেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ সুরাবর্দি। আর সেটাই আগুন দেয় বারুদের স্তূপে। কলকাতা জুড়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বহু লোক মারা পড়ে। সরকারি মদতে

কলকাতার ত্রাস হয়ে ওঠে কলুটোলার হাফিজ খান, মিনা পেশোয়ারির মতো পাঠানের দল। ওদের সঙ্গে টক্কর দিতে তৈরি হয় পাল্টা দল। নেতৃত্বে ছিলেন ভানু বোস, গোপাল মুখুজ্জ্যে, প্রভাত, সত্যেন, জগা, গোবর্ধন বাগ, চিত্ত বাগরা। চন্দননগরের বিখ্যাত রাম চ্যাটার্জিও ছিলেন এই দলে। দুই শক্তিশালী দলের লড়াইয়ে খুন, পাল্টা-খুনে লাল হয়ে ওঠে কলকাতার মাটি। ইতিহাসে যা 'গ্রেট ক্যালকাটা ফিলিং' নামে পরিচিত। দাঙ্গা শুধু কলকাতায় আটকে থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। লাখেরও বেশি মানুষ খুন হয়ে যান। গান্ধীজির অনশন, দেশভাগ, ইতিহাসের জল গড়িয়েছে অনেক দূর।

বৃদ্ধ গোপাল মুখুজ্জ্যের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। পুরনো অনেক কথাই শুনিয়েছিলেন। কাকা অনুকূলচন্দ্র ছিলেন নামকরা স্বদেশী। ডালহৌসির রডা কোম্পানির অস্ত্রলুণ্ঠনে তিনি ছিলেন অন্যতম পাণ্ডা। কলেজ স্ট্রিট প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের সংযোগে ওঁর একটা পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল। গায়ে বড় বড় করে লেখা 'বাঙালির পাঁঠার দোকান'। বামুনের ছেলের পাঁঠার দোকান, ব্যাপারটা তখন আলোচনার বিষয় ছিল। এই দোকান থেকেই সংগঠনের কাজ চালাতেন অনুকূলবাবু। ভাইপো গোপালের ওপর পরে দায়িত্ব পড়ে দোকানের। দাঙ্গায় বহু লোককে খুন-করা গোপালের ওপর সম্ভবত বিরক্তিতে এবং পাঁঠার দোকানি বলেও তাঁর নাম হয়ে যায় গোপাল পাঁঠা। ওঁর সরস্বতীপুজো ছিল দারুণ জাঁকজমকপূর্ণ। ভানু বোসের ছিল কালীপুজো আর জলসা। ক্রিক রোয়ের সেই জলসায় গান করেননি হেন বড় শিল্পী ছিলেন না। এসেছেন তাবৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীও। ভানু-গোপাল জুটি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশ্বস্ত অনুচর। ওঁদের নামেই কলকাতা কাঁপত। সাংবাদিক সুপ্রিয় চৌধুরি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন এক লেখায়। ওঁর এক আত্মীয়া থাকতেন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে। একদিন তাঁর বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছে। পাড়ার মোড়ে দলবল নিয়ে বসেছিলেন গোপাল পাঁঠা। রক থেকে তিনি বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়েন— 'কোথায় গিয়েছিলে মা?' মেয়েটি মিনমিন করে জানায়, মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে। আবার প্রশ্ন— 'রাস্তায় কেউ বিরক্ত করেনি তো?' মেয়েটি ঘাড় নেড়ে কোনো মতে জানায়— না। গলায় স্নেহ মিশিয়ে উত্তর আসে— 'ঠিক আছে, বাড়ি যাও।'

এই ধরনের মস্তানদের প্রজন্ম শেষ হয়ে গিয়েছে। এখনকার প্রোমোটারি করা, মদের ঠেক চালানো, বাতিল লোহা বিক্রি বা কয়লা খনি নিয়ন্ত্রণ করা, ওয়াগান-ভাঙা নব্য মস্তানদের সঙ্গে ওঁদের বিস্তর অমিল। পুরনো বাহুবলীরা ছিলেন পাড়ার অঘোষিত অভিভাবক। সাধারণ মানুষের ওপর অন্যায় জুলুম একেবারেই তাঁদের পছন্দ ছিল না। এলাকার মেয়েদের মানইজ্জত নিয়ে প্রচণ্ড সচেতন ছিলেন। আজকালকার মস্তানদের ন্যূনতম মূল্যবোধের বালাই নেই। যে কোনো অপরাধ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। বিনিময়ে টাকা পেলেই হল। পাড়ার মেয়ের হাত ধরে কোনো নির্ণীয়মান বাড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়া বা মোটরবাইকে তুলে হোটেল-রিজর্টে যাওয়া তো বীরত্ব ও বিনোদনের প্রকাশ। আগের সময় হলে কামদুনির ধর্ষকের লাশ পড়ে থাকত রাস্তায়।

শুধু অভিভাবক-মস্তানরাই নন, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদেরও দাপট ছিল রীতিমতো। উঠতি সিগারেট-ফোঁকা দলকে তিন-চার পাড়া উজিয়ে যেতে হত সিগারেট খেতে। সেই পাড়ারও কোনো গুরুজনকে দেখে লুকোছাপা করতে হত। কারণ, তাঁরাও অনেক সময় ডেকে জানতে চাইতেন, কোন পাড়ার ছেলে ইত্যাদি। আর চেনা বেরিয়ে পড়লে অবধারিত খবর চলে যেত বাড়িতে। তারপর শুরু হত বাবার জুতো না ছেলের পিঠ, কার চামড়া মজবুত তার পরীক্ষা। অন্যায় করলে পাড়ার জ্যেঠা-কাকাদের কান মলে দু-চার ঘা দিয়ে দেওয়ার অবাধ অধিকার থাকত। এ নিয়ে কারও বাবা-মাকে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে দেখা তো দূরস্থান, জানতে পারলে ওঁরা বলতেন, আরও দু ঘা দিলে না কেন! এখন পাড়াতুত গুরুজন তো দূরের কথা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মারলেও তাঁদেরই একদিন, কি অভিভাবকদের একদিন। প্রতিবাদে সামিল হন অন্য অভিভাবকেরাও। সেই সঙ্গে লেলিয়ে দেন টিভিওয়ালাদের। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিষ্ঠুরতার জ্বালাময়ী লেখা ছাপা হয় খবরের কাগজে। আর আগে শিক্ষকেরা পিঠে বেত ভাঙতেন। অভিভাবকদের ভ্রূক্ষেপও থাকত না। (এই উদাহরণ ছাত্রধোলাইয়ের পক্ষ সমর্থনের জন্য নয়)। দু-তিন দশক আগে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়া ছাত্ররা 'লেডিস সিট'-এ বসাকে অগৌরবের মনে করত। এখন দশম-একাদশ শ্রেণীর ছেলেদেরও স্কুলের সামনে হত্যে দিয়ে থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন মায়েরা। বাসে সেই ছেলেরা নির্বিকারে বসে থাকে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে।

পরিচারক বা কাজের লোকেরা কথাটা বাদ যাওয়া উচিত নয়। আগে মধ্যবিত্ত পরিবারেও একজন রামুকাকা, হরিজ্যেঠা থাকতেন। সাম্যবাদীরা যতই শোষণ-তত্ত্ব দিন। তথাকথিত কাজের লোকেরা পরিবারেরই একজন হয়ে উঠতেন। যে ছেলে ওঁদের হাতে মানুষ। সে বড় হয়ে বাড়ির কর্তা হলেও

রামুকাকাদের গুরুজন জ্ঞানই করতেন। সম্পর্কটা নিছক মনিব-ভৃত্যের বৃত্ত ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে উঠত। পুরনো বাংলা গল্প-উপন্যাস বা সিনেমায় এঁদের দেখা পাওয়া যাবে। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কেষ্টার কথা মনে করুন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে বসন্তরোগে আক্রান্ত উপেনকে বন্ধুরা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। কেষ্টা সেবা করে বাঁচায়, আর সে নিজে বসন্তে মারা যায়। এ তো সাহিত্যের চরিত্র। বাস্তবের একটা উদাহরণ দিই। কৌতুক-অভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাজের লোক ছিলেন। মেদিনীপুরে বাড়ি। নৃপতি তাঁকে 'সেবক' বলতেন। ওঁর একটা মাসমাইনে বরাদ্দ ছিল। কিন্তু কোনোদিনই তিনি সেটা দাবি করেননি। দিতে চাইলেও নিতেন না। নৃপতির ডাক নাম ছিল 'প্রভু'। প্রভুর সেবা করাই যেন ওঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল। প্রায় প্রতিদিনই মদের নেশা যখন চড়ত, নৃপতি ওঁকে বরখাস্ত করতেন। পরদিন সকালে প্রভুকে চা করে খাইয়ে সেবক যখন তাঁর একমাত্র সুটকেসটি নিয়ে চলে যাওয়ার উদ্‌যোগ নিতেন, তখন নৃপতি তাঁকে আবার মৌখিক নিয়োগপত্র দিয়ে বহাল রাখতেন। সেবকও খুশি মনে সুটকেস রেখে লেগে পড়তেন সংসারের কাজে। বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের এই সম্পর্ক কোন মার্ক্সিয় তত্ত্বে ব্যাখ্যা করবেন! আর এখন বাড়ির কাজের লোককে বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। আগেভাগে ছবি তুলে থানায় দিয়ে আসতে হয়। এরা সাঁট করে সুযোগ বুঝে দরজা খুলে দেয়, কখনও নিজেরাই খুন করে সব নিয়ে পালায়।

চোর-ডাকাতদের কথা হয়েছে, এবার সমাজের সম্মাননীয় চিকিৎসকদের কথায় আসা যাক। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সেরা ছাত্রদের ইন্টারভিউ কাগজে ছাপা হয়। তারা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশসেবার কথা বলে। ডাক্তারি পাস করার পর তাদের সেবার ধুম দেখে ঘুম ছুটে যায়। চিকিৎসকেরা এখন প্রকৃত অর্থেই সাম্যবাদী। রোগী মানে 'পেশেন্ট'। সে ধনী, না নির্ধন— ভাবার প্রয়োজন নেই। অপ্রয়োজনে গাদা পরীক্ষার সুপারিশ করে সেখান থেকে কমিশন, ওষুধ কোম্পানির উপহার, সর্বোপরি নিজের মোটা ফি। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ! নার্সিংহোমগুলো অনেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো। রোগীর পরিবারের টাকা হুহু করে শুষে নেয়। আজ বিল শুনলেন ১০ হাজার টাকা। দু দিন পরে ছাড়িয়ে আনার সময় দেখলেন তা ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে। মৃতজনকে ভেন্টিলেটর নামক ম্যাজিক-যন্ত্রে বেঁচে আছে দেখিয়ে টাকা নিতেও এদের হাত কাঁপে না! আগের দিনে চিকিৎসকেরা এঁদের কাছে নেহাত বোকা। পাড়ার অসুস্থ গরিব লোকটাকে দেখার পর তাঁর স্ত্রী বা ছেলে ডাক্তারবাবুর ভিজিট দিতে গেলে, তাকে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করতেন। প্রতি পরিবারেরই একজন পারিবারিক চিকিৎসক থাকতেন। সেই চিকিৎসকের সঙ্গে রোগী ও তার পরিবারের গড়ে উঠত পারিবারিক সম্পর্ক। সামাজিক অনুষ্ঠানে একে-অপরকে নিমন্ত্রণ করতেন। ডাক্তার গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের পারিবারিক ডাক্তার। চেম্বারে গেলে আগে রোগের কথা নয়, বাড়ির অন্যদের খবরাখবর নিতেন। এমনকি বিয়ে হয়ে যাওয়া দিদিদেরও। অনেক সময়ই ওষুধ দিতেন না। বলতেন, ভাগ কিচ্ছু হয়নি। বেশি করে খা, ঠিক হয়ে যাবে। কিংবা কিছু পথ্যের নিদান দিতেন। এখনকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না। এটাই নাকি পেশাদারিত্ব!

শিক্ষকতার প্রসঙ্গ আগেই টানা হয়েছে। আগে শিক্ষককে গুরু মানা হত। সেই মতো শ্রদ্ধাও করা হত। এখন শিক্ষা একটা পরিষেবা। যা অর্থের বিনিময়ে মেলে। ফলে গুরুফুরু ধারণা 'অবসোলিট'। শিক্ষক-ছাত্রী প্রেম ক্রমশ সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠছে। নোয়াপাড়াতে এক শিক্ষকের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে একটি মেয়ে তার বাবা-মাকে পৃথিবী থেকে সরাতেও পিছুপা হয় না। ধন্য প্রেম! আবার ছাত্রও দিদিমণির প্রেমে, থুড়ি শরীরী বাঁধনে বাঁধা পড়ছে। সম্প্রতি এই গৌরবজনক ঘটনা নিয়ে 'আমি ও আমার গার্লফ্রেণ্ড' নামে বাংলা এবং 'নশা' নামে হিন্দি ছবিও হয়ে গেল।

প্রেমের কথায় ব্যর্থ প্রেমের প্রসঙ্গটা টানা উচিত। আগে ল্যাঙের ব্যাপার মেয়েদেরই একচেটিয়া ছিল। তার কারণ হিটলার বাবা। মেয়ে প্রেম করছে খবর পেলেই জোর করে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ফলে ব্যর্থ প্রেমিকরা ছিল দলে ভারী। আর ওদের মডেল ছিল 'দেবদাস'। উস্কোখুস্কো চুল-দাড়ি। দু-একজন ধরত নেশা। পুরনো প্রেমিক বা প্রেমিকার স্মৃতি বুকে করে কেউ আজীবন বিয়ে না করেই কাটিয়ে দিত। এদের উদ্দেশেই কবিরা লিখতেন— বিরহ বড় ভাল লাগে। এখন চলছে অ্যাসিড-যুগ। দেবদাস পারুকে ছিপ দিয়ে মেরেছিল। তাতে পারুর বড়সড় ক্ষতি হয়নি। বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু এ যুগের দেবদাসরা প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে জন্মের মতো বিকৃত করে দিতে চায়। অ্যাসিড ছোঁড়ার ধুম পড়ে যেতে অ্যাসিড বিক্রির ওপরেই নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। গলায় দড়ি বা গামছা পেঁচিয়ে মারলে হয়ত ওগুলো বিক্রিতেও কড়াকড়ি হবে!

একটা সময় ছিল সব পরিবারেই ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা মানুষ হত মামারবাড়িতে। দাদু-দিদিমার আদর তো ছিলই।

দু-একজন ব্যতিক্রম থাকলেও, মামিমারাও তাদের বোঝা মনে করতেন না। মামারবাড়ির আবদারের অনেকটাই মিটত মামাদের ঘাড় দিয়ে। এখনও মামারবাড়ি আছে। তবে সেই আবদার গিয়েছে। মামিমারা না হয় পরের বাড়ির মেয়ে, মামারাও উটকো ঝামেলা নিতে চান না। ফ্ল্যাটে জায়গা কম, এই রোজগার, জিনিসের যা দর— অজুহাতে কম পড়ে না। আসলে যা নেই, তা মন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। কুসঙ্গে পড়ে বখে যাচ্ছিলাম বলে ছোটবেলায় আমাকেও মামারবাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। মামাদের অবস্থা যে খুব সচ্ছল ছিল তা নয়, তবু তাঁদের বোঝা, এমনটা কখনও মনে হয়নি। বলা ভাল, ওঁরা মনে করতে দেন নি।

ভাই-বোনের সম্পর্ককে বাঙালি পরিবারে পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়। ভাইফোঁটা, রাখি পূর্ণিমা— অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। এগুলো সবই ছেলেমানুষ বয়সের। বয়স হলে বিষয়-জ্ঞান হলে, যখন টাকা-পয়সা বা সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন আসবে, অমনি বেরিয়ে পড়বে নখ-দাঁত। পৈতৃক বাড়ি প্রমোটরকে দেওয়া হচ্ছে বা সরকার চাষের জমি নেওয়ার দরুন ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। ভাইয়ের অবস্থা ভাল নয়, বোনের বেশ সচ্ছল। তাই বলে ভাইকে সবটা মেরে দিতে দেওয়াও যায় না। থাকুক না থাকুক নিজের ভাগের ফ্ল্যাট বাগিয়ে নেয়। এ সব নিয়ে পবিত্র সম্পর্ক লাঠালাঠি থেকে মুখ দেখাদেখির খন্দে মুখ থুবড়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আরেকবার ফিরি মামারবাড়ির কথায়। যে ক বছর ছিলাম দেখেছি, ঠিক ভাইফোঁটার দিন সকালে দাদুর এক বোন আসতেন। অনেক দূর থেকে। অতি দরিদ্র। পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যেত। সাদা মলিন শাড়ি পরনে। একটা ছোট্ট কৌটোয় দাদার জন্য কটা নারকোল নাড়ু নিয়ে আসতেন। ঘরে তৈরি। এর বেশি ওঁর সাধ্য ছিল না। আমার জাঁদরেল দাদুও কেমন জানি ছোট্টটি হয়ে যেতেন। আমি তখন বেশ ছোট— এখনও ভাই-বোনের সেই নিখাদ ভালবাসার ছবিটা মনে ভাসে। এমন নানা ভাল গুণ আর মূল্যবোধ হাতড়াই। ধরতে পারি না। পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে। সব কেমন জানি দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। কিছু ভাল গুণ। এই ভাল ব্যাপারটা প্রজন্ম-নিরপেক্ষ। অনেকটা সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে-র মতো। অপত্যস্নেহ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন তো বটেই, অনাত্মীয় কেউ বিপদে পড়লেও তাকে সাহায্য করা, গুণী মানুষের কদর করা, শিশুদের ভালবাসা— সদ্ গুণের নমুনা। ইউনিভার্সাল ট্রুথ-এর মতো চিরকালীন সত্য।

সবশেষে বড়লোকেদের প্রসঙ্গ। আগে বড়লোকদের সংখ্যা ছিল কম। দু-চারজন জমিদার-জোতদার। ওঁদের অনেকে অত্যাচারী ছিল। আবার অনেকে সন্তানদের মতো আগলে রাখত প্রজাদের। আগের দিনের বড়লোক অনেক টাকা কামাত ঠিক, আবার কেউ গাঁয়ে পুকুর কাটিয়ে দিত, কেউ বানিয়ে দিত পান্থশালা বা রাস্তা, গড়ে দিত স্কুল-পাঠশালা, মন্দির। তাঁদের বাড়ির উৎসবে শরিক হত গাঁয়ের সবাই। যাত্রাপালা, কবিগান শুনত। ভালমন্দ খেতেও পেত। এখনকার বড়লোকেরা টাকার অঙ্কে ওঁদের কিনে রাখতে পারেন। একটার জায়গায় দশটা গাড়ি কেনেন। বাড়ির বিলাস উপকরণ দেখলে হাঁ মুখ বন্ধ হবে না। ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পচে। কিন্তু পয়সা খরচ করতে দেখা যায় না। আয়লায় ৫০ লাখ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও একটা পয়সা ঠেকান না আমাদের ক্রিকেট আইকন। উল্টে প্রভাব খাটিয়ে সস্তায় সরকারি জমিও বাগান। অথচ মতিলাল শীল, রাজেন্দ্র মল্লিকদের দানের হিসাব করা কঠিন। জগদীশচন্দ্র বসু, রাসবিহারী ঘোষ, এস আর পালিতের মতো বিজ্ঞানী-অধ্যাপকেরাও নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা দান করে গিয়েছেন শিক্ষার উন্নতিতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনের পুরোটাই দান করে গিয়েছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল করেছিলেন বাঙালিকে ব্যবসামুখী করতে। এমন উদাহরণ ঢের রয়েছে। এখনকার বড়লোকের অর্থ শুধু নিজের ভোগের আর লোককে দেখানোর। মূল্যবোধের অবক্ষয় ধনী-গরিব কাউকেই ছাড়ে নি।

রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা না বলাই ভাল। ইংরেজদের সময় ছাত্র-যুবাদের মনে স্বদেশপ্রেম ছিল। অনেকে দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। অনেকে নিজের দেশ গড়তে হাত লাগালেন। তার পরে এল সাম্যবাদের ঢেউ। রাশিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাও গেল। চীনও ডিগবাজি খেয়ে পড়েছে। এখন রাজনৈতিক আদর্শের জায়গাটা বেবাক ফাঁকা। অবধারিত ফল রাজনীতিতে ধান্দাবাদেরই জয়জয়াকার। রাজনীতি এখন ক্ষমতা আর অর্থের ছাড়পত্র বিলোয়!

পুনঃ এ অভিজ্ঞতা আমার একার নয়। মধ্যবয়সী অনেকেরই। আর পাঁচটা জাতের চেয়ে এই গুণে বাঙালি অনন্য ছিল। আমরাই একসময় বেঁধেছিলাম 'ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ' গান। ভাষা, সংস্কৃতি, রুচি বাঙালির সব বদলাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধও। এটা কি তাহলে বাঙালি জাতিরই অবক্ষয়? পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীরাই বলতে পারেন!

উমা

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক,
উৎস মানুষ
মহাশয়,

উৎস মানুষ পত্রিকার গোষ্ঠীর সকলকে ধন্যবাদ। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকাশিত রচনার এক সুদৃশ্য সঙ্কলন প্রকাশ করার জন্য। অশোকদার সঙ্কলিত রচনার সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য এই চিঠি নয়। তাঁর রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশিত। একসঙ্গে অশোকদার এই রচনাগুলি প্রকাশ করে উৎস মানুষ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংগঠন ও সাথীদের এই সঙ্কলন অনুপ্রেরণা জোগাবে। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এই সঙ্কলন সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত নিবেদন করি।

১) সঙ্কলনটির নাম— 'লেখালিখি'। বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে এই শব্দটি নেই। যদিও 'লেখালেখি' শব্দটি আছে। কিন্তু রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' গ্রন্থে লেখালিখি শব্দটি আছে। যার অর্থ অপরের দ্বারা লেখিত করা। আলোচ্য গ্রন্থে 'লেখালিখি' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক বোধগম্য হয় না। 'সঙ্কলন' বানানটি সঠিক। তবুও 'সংকলন' বানানটি প্রচ্ছদে ব্যবহার হলেই বোধহয় ভালো হত। যদিও প্রথম পৃষ্ঠায় 'সংকলন' ছাপা হয়েছে। আবার সূচীপত্র ও প্রথম রচনার শিরোনামে 'সঙ্কলন'।

২) সংকলন গ্রন্থের প্রচ্ছদ প্রশংসার দাবি রাখে। অশোকদার রৈখিক অবয়বটি অসাধারণ। সম্ভবত এই চিত্রের শিল্পী শুভ্রনীল ঘোষ। কারণ প্রচ্ছদ হিসাবে এই নাম প্রকাশ হলেও প্রচ্ছদ শিল্পী হিসাবে এই নাম উল্লেখ থাকলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হত।

৩) কপিরাইট কথাটির উল্লেখ আছে। এখানে সত্ত্বাধিকারী অনায়াসেই ব্যবহার করা যেত।

৪) সম্পাদকের লেখায় চতুর্থ লাইনে 'কামানো' শব্দটি আছে। অশোকদার লেখায় কখনও এই ধরনের শব্দ ব্যবহার হতে দেখিনি। তাই এই শব্দটি অশোকদা প্রসঙ্গে বড়ই বেমানান লাগছে। অশোক কি পারতেন আর কি পারতেন না এটা বোধহয় অশোকদার ঘনিষ্ঠরা সকলেই জানেন। আলাদা করে বলে বোঝানোর কোন প্রয়োজন হয় না। এতে অশোকদার গরিমা আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

৫) সম্পাদক মহাশয় ব্যক্তিগত জীবনে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন ধরে নেওয়া যেতেই পারে। তবুও সম্পাদক হিসাবে দু-চার কথা লিখতে গিয়ে শুধুমাত্র 'অশোক' সম্বোধন এড়িয়ে গেলেই ভাল করতেন।

৬) দু-চার কথায় সম্পাদক বজরুল রহিমের সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন অথচ লেখার নীচে সাহায্যকারীদের তালিকায় এই নামটি উল্লিখিত হয় নি। আর যাঁদের নাম এই তালিকায় বাদ পড়ে গেছে, 'তাঁরা ক্ষমা করে দেবেন' এই ধারণা সম্পাদক মহাশয় নিজে থেকেই ধরে নিয়েছেন। যদিও এই ত্রুটির ব্যাপারে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন নি।

৭) অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা যারা অশোকদার ব্যক্তিগত জীবন খুবই কম জানি তাদের কাছে মানুষটি পুরোপুরি ধরা পড়েছে। তবে একটা উল্লেখ না করে পারছি না যে, একদম শেষে উল্লিখিত হয়েছে যে, 'যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল ... প্রাণপণে সমাজের জঞ্জাল সরানোর কাজটাই করে গিয়েছে।' কিন্তু আমি জানি যে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত অবস্থায় মরণোত্তর দেহদান করার অঙ্গীকার করেছিলেন। পারিবারিক বাধায় শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। তবুও এটাই বলা যায় যে দেহ থেকে প্রাণ বেড়িয়ে যাবার পরও তিনি দেহটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

আমি জানি না যে, অশোকদার শেষ ইচ্ছাকে আমরা মর্যাদা দিতে না পারার দায় কার? আমি মনে করি এই দায় আমাদের সকলের, শুধুই পরিবারের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সমাজের জঞ্জাল সরানোর কাজটা মৃত্যু থামিয়ে দেয় নি। থামিয়ে দিয়েছি আমরা। যাঁরা অশোকদার নিথর দেহটাকে ঘিরে চোখের জল ফেলেছি আর সংস্কার বিরোধী কথা বলে সংস্কারের সাথে আপোস করেছি। সমাজসচেতন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

৮) সূচীপত্রটি দুই পাতার। কয়েকটি লেখার শিরোনামের সাথে সূচীপত্রের বিষয়ে কিছু পার্থক্য ধরা পড়ে। যেটা না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

৯) সূচীপত্রে 'উৎস মানুষে প্রকাশিত লেখা' থাকলেও '৯' পাতায় আছে 'উৎস মানুষে লেখালিখি'। সংকলনের নামকরণের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। আবার ১৩৩ পাতায় 'লেখালিখি' হয়ে গেছে 'লেখা'। তবে কি উৎস মানুষের রচনা 'লেখালিখি' আর অন্য পত্রিকার রচনা 'লেখা' হিসাবে বিভক্ত করা হয়েছে?

১০) 'শালগ্রামশিলার বিজ্ঞানরহস্য' রচনাটি 'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'লেখালিখি' সংকলনে এই রচনার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া

অপর লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের নামের আগে 'আয়ুর্বেদাচার্য' যুক্ত হয়েছে এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার থেকে পূজারী নিশাকর দেবশর্মা (বাগবাজার) ও প্রেসিডেন্সী কলেজের জিওলজি বিভাগ বাদ পড়েছে। এটা ত্রুটি।

১১) 'যৌনদাসী না যৌনশ্রমিক' বিশেষ সংখ্যা থেকে একটি রচনা নেওয়া হয়েছে। রচনাটির শিরোনামের ২য় লাইনে 'কি' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ১ম লাইনের শেষে 'কমা' যতিচিহ্ন দেওয়া হয় নি। তাছাড়া এই রচনাটিতে বেশ কিছু অমিল আছে। একদম শুরু থেকেই।

১২) সংকলনটি সম্বন্ধে ইংরাজিতে উল্লেখ আছে— an Utsa Manush Sankalan। যেখানে 'an' বলা হয়েছে সেখানেSankalan-এর ইংরাজি প্রতিশব্দ থাকাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাই বাংলায় উৎস মানুষ সংকলনের আগে একটি শব্দ থাকা উচিত ছিল।

১৩) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে লেখা প্রবন্ধ দুটি 'দুগ্ধবতী বাছুর' ও দুগ্ধবতী পুরুষ ছাগল' বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান সংকলনের ২য় খণ্ডে ছাপা আছে। এটির উল্লেখ নেই। চিত্রশিল্পীর নামও উল্লিখিত হয় নি।

১৪) সংকলন গ্রন্থটি সম্বন্ধে কিছু কথা চতুর্থ প্রচ্ছদে থাকলে ভালো হত। সঙ্গে অবশ্যই অশোকদার ছবি।

১৫) অশোকদার প্রয়াণের পর সম্ভবত পাঁচটি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা হয়েছে। অনুষ্ঠানের দিন, বক্তার নাম, বক্তব্যের বিষয় ও স্থানের উল্লেখ দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রচ্ছদে অনায়াসে দেওয়া যেতে পারত। ভবিষ্যতে এই নথি গুরুত্ব পেতে পারত।

সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

সম্পাদকের জবাবদিহি

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি সুচিন্তিত, মূল্যবান চিঠি লেখার জন্য। চিঠিতে তোলা দু-একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে ওঁর এবং উৎস মানুষের তাবৎ পাঠক তথা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই, বইটিতে বর্ণবিভ্রাটের জন্য। কম্পিউটারের গোলমালে প্রথম কয়েকটি লেখায় 'জ' এবং 'ট' হয়ে গিয়েছে 'ত'। শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়োয় এই ত্রুটি মেরামত করা সম্ভব হয় নি।

সঙ্কলনটির নামকরণ নিয়ে সীতাংশুবাবু ধন্দে পড়েছেন। এখানে 'লেখালিখি' মসীযুদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান')। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন আপসহীনভাবে অন্ধতা ও কুযুক্তির বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালিয়েছিল এটা মাথায় রেখেই। 'চলন্তিকা' থেকে যে অর্থ উনি উদ্ধার করেছেন, তা ঠিক নয়। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেননি, ওটা 'লিখানো লিখনো, লেখানো'র মানে, লেখালিখি-র নয়। সঙ্কলন বা সংকলন নিয়ে উনি ঠিকই বলেছেন, যে কোনো একটা বানান লেখাই উচিত ছিল।

কপিরাইট কথাটির বদলে 'সত্ত্বাধিকারী' ব্যবহারের পরামর্শও ঠিক। তবে সেক্ষেত্রে বানানটা 'স্বত্বাধিকারী' লিখতে হত।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অশোক' সম্বোধন করাটা ওঁর পছন্দ হয়নি। কী লিখলে ভালো হত সে পরামর্শ অবশ্য দেননি। প্রথমত জানাই, পত্রিকায় বা এই বইটিতে সম্পাদক হিসাবে একজনের নাম ছাপা হলেও, আমাদের একটি সম্পাদকমণ্ডলী আছে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'অশোক' লেখা প্রসঙ্গে জানাই— আমরা কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নজরুলের গান, সত্যজিৎ-ঋত্বিকের ছবি বা উত্তম-সৌমিত্রর অভিনয় নিয়ে আলোচনা করা বা লেখার সময় কালিদাসমশাই, রবীন্দ্রনাথবাবু বলে উল্লেখ করি না। তাতে যদি তাঁরা আমাদের বন্ধুস্থানীয় না হয়ে যান, তাহলে 'অশোক' লিখলে কেন সেটা হবে, বোঝা গেল না।

সীতাংশুবাবু লিখেছেন, 'দেহ থেকে প্রাণ বেড়িয়ে (হবে বেরিয়ে) যাবার পরও তিনি দেহটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।' এ প্রসঙ্গে জানাই, মরণোত্তর দেহদান আন্দোলনের রকমসকম দেখে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের দিকে আশাভঙ্গ হয়েছিল। সে বিতর্ক সরিয়ে রাখলেও, এটা মাথায় রাখা দরকার যে, দেহ দান করাটা একটা অঙ্গীকার। কোনও আইনি ইচ্ছাপত্র নয়। মৃতজন স্বয়ং নিজের দেহটা কারও হাতে দিয়ে যেতে পারেন না। তাই অঙ্গীকারপূরণ করার দায়িত্ব মৃতের পরিবার তথা আত্মীয়স্বজনের। সেখানে অন্য কারও বিপ্লব করার অবকাশ নেই। শুধু অশোক নন, বিশিষ্ট বাম বুদ্ধিজীবী চিন্মোহন স্নেহানবিশ থেকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়— অনেকের ক্ষেত্রেই একই জিনিস ঘটেছে হয়ত ভবিষ্যতেও ঘটবে। এ নিয়ে জানুয়ারি ২০০৯ 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা'র সম্পাদকীয়তে আমাদের মতামত আছে।

'শালগ্রামশিলার বিজ্ঞানরহস্য' লেখাটি 'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' থেকে নেওয়া হয়নি। মূল পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। তাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে দুটি নামই ছিল।

পুনরায় পত্রলেখককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যে সব ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, যে পরামর্শ দিয়েছেন, পরবর্তী সংস্করণের সময় তা মাথায় রাখা হবে।

পরিশেষে সীতাংশুবাবুকে আবারও ধন্যবাদ জানাই তাঁর পত্রের জন্য।

উমা

সংগঠন সংবাদ

চেতনার বিজ্ঞান মেলা

কলকাতার মেলার ক্যালেন্ডারে হাতিবাগান চেতনা গণসাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত মেলাটি অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে। এবার ২৪শে পড়ল। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ২ জানুয়ারি ২০১৪ স্টার থিয়েটার লাগোয়া রাস্তাটি মেলার ভিড়ে ছিল জমজমাট। অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে হাতিয়ার করে নিয়েছে 'চেতনা'। বিজ্ঞান মেলার প্রদর্শনীতে তারই প্রতিফলন দেখা গেল। 'পেরিয়ারের জীবন ও কাজ', 'সুন্দরবন বাঁচাও', হিরোসিমা থেকে ভূপাল, আবর্জনা, পানীয় ও প্রসাধনীর বিপদ নিয়ে পোস্টারগুলির সামনে কৌতূহলী দর্শকের ভিড় লেগেই ছিল। প্রতিবারের মতো এবারেও ছিল চেতনার সদস্যদের 'অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক', ছিল পথনাটক— দুখু শ্যাম চিত্রকরের নির্দেশনায় ভেষজ রঙ তৈরির কর্মশালা, নটী বিনোদিনীকে নিয়ে তথ্যচিত্র 'বিনোদ-কথা'। আন্তরিক উদ্যোগে বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই 'বিজ্ঞানমেলা'র আয়োজন করে 'চেতনা' প্রমাণ করে দিল ধারাবাহিকভাবে ভাল কাজ করে যেতে পারলে এ কাজে বিজ্ঞানমেলার জনপ্রিয়তা এতটুকুও কমে না।

• গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ দিনটি এ রাজ্যে চক্ষুদান আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ছিল। শ্রীরামপুর চক্ষু ব্যাঙ্ক এদিন ভদ্রেশ্বরে দুটি কর্ণিয়া সংগ্রহ করে। ২০১৩-তে সংগঠনটি ২০০ জোড়া কর্ণিয়া সংগ্রহ করে, যা ১ বছরে সর্বাধিক।

• বিবর্তন বিজ্ঞান সংস্থা (চন্দননগর) গত ১৫ সেপ্টেম্বর চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহে 'ক্যান্সার ও তার প্রতিকার' বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। মুখ্য বক্তা ছিলেন গবেষক মঞ্জু রায়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সঞ্চয়িতা মুখোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। এরপর সংস্থার কাজকর্ম ও উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন সংস্থার সভাপতি ভাস্করানন্দ সুর। মঞ্জু রায় বলেন ক্যান্সার মোটেই আর দুরারোগ্য নয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে এ রোগ সেরে যায়। শরীরে ক্যান্সারের জিন থাকলেও ক্যান্সার মোটেই সংক্রামক নয়। যাদের শরীরে প্রতিরোধী শক্তি কম থাকে, তাদেরই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আশার এক কথাও তিনি শোনান, সম্প্রতি তাঁরা ক্যান্সারের একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। বহু মানুষের ওপর প্রয়োগ করে এর সফলতাও পাওয়া গেছে, তবে সেটি বাজারে আসতে কিছুদিন সময় লাগবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল প্রশ্নোত্তর। আলোচনা সভাটির আহ্বায়ক ছিলেন দীপনারায়ণ দত্ত।

প্রতিবেদন

রমণী সরকার স্মরণ

হরিণঘাটা উৎসমানুষ পাঠচক্র ও হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় রমণী সরকার মহাশয়ের বাড়িতে ১৫ ডিসেম্বর, রবিবার বিকেল ৩টেয় শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নগর উখড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অরিন্দম ভৌমিক। শুরুতেই শ্রদ্ধেয় রমণী সরকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তারপর সরকার মহোদয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তাঁর পত্নী রঙ্গবালা সরকার, পুত্র সত্যবান এবং পুত্রবধূ ঝুমা সরকার। পরিবারের তরফ থেকে মাল্যদানের পর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ডাঃ সতীশচন্দ্র মণ্ডল জানান প্রয়াত রমণী সরকারের দুটো চোখ দিয়ে এখন দুজন অন্ধ মানুষ পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছেন। এর চেয়ে বড় মানবিক দান আর কিছু হতে পারে না। এই সভার আয়োজনের উদ্দেশ্য এই দৃষ্টান্তকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। রমণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সত্যবান সরকার বলেন ১৫ সেপ্টেম্বর '১৩ বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আর জি কর হাসপাতালে গেলাম। বাবার বেডের কাছে যেতেই দু'জন ডাক্তার এগিয়ে এলেন। নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, তাঁরা ব্যারাকপুর প্রভা আই ব্যাঙ্কের ডাক্তার। অত্যন্ত দরদী মনে বিনয় সহকারে বললেন, আপনার বাবার সৎকারের মাধ্যমে শরীরের সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সরকার মহাশয়ের দুটি চোখের কর্ণিয়া যদি আমাদের আই ব্যাঙ্কের জন্য সংগ্রহ করার অনুমতি দেন তাহলে আপনার বাবার কাছ থেকে নেয়া এই মহৎ দানে দু'জন অন্ধ, দুঃস্থ মানুষ যারা বর্তমানে পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। ফলে তারা আপনার-আমার মতো স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। ডাক্তারবাবুদের এ আবেদনে অশ্রুভারাক্রান্ত মনে সম্মতি জানালাম। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সইসাবুদ করা হল। আমাদের চোখের সামনেই মিনিট দশেকের মধ্যে বাবার চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করে উপযুক্ত পাত্রে রেখে বাবা ও আমাদেরকে শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন।

সত্যবানের স্ত্রী ঝুমা বললেন, বাবার চোখ যেখানেই থাকুক আমাকে দেখছে— এ ভেবে সান্ত্বনা পাই।

এরপর ডাঃ সুশীল বিশ্বাস বলেন, যদি সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকে তা হলে আমরা চক্ষুদান ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রভূত উপকার করতে পারি। শ্রদ্ধেয় রমণী সরকার ও তাঁর পরিবার-পরিজন তার উদাহরণ রেখেছেন। হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর ঘোষ বলেন চক্ষুদান, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দান ও দেহদানের ক্ষেত্রে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানর জন্য আমাদের এই গণবিজ্ঞান সংগঠন দায়বদ্ধ। **নিরঞ্জন বিশ্বাস, বড়জাগুলি, নদীয়া**

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হতে হলে

গ্রাহক চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 7000073.
Utsa Manush, SB Account No. 0083010748838।

এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা আমাদের ঠিকানায় চেক পাঠান। ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন জানিয়ে দিন। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই

পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুণ্ডু

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা- ৭০০০১২

(কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

পুস্তক তালিকা

- যে গল্পের শেষ নেই — ৫০.০০
  দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ — ৪২.০০
  (৫ম প্রকাশ) সংকলন
- প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ — ৩০.০০
  অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
- তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) — ১৮.০০
  রণতোষ চক্রবর্তী
- বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু — ৪০.০০
  হিমানীশ গোস্বামী
- এটা কী ওটা কেন — ৫০.০০
  সংকলন
- আমরা জমি দেই নি, দেব না — ১০.০০
- আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান — ৫০.০০
  সংকলন
- আরজ আলী মাতুব্বর — ২০.০০
  ভবানীপ্রসাদ সাহু
- প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে — ৬০.০০
  দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)
- বিবেকানন্দ অন্য চোখে/
  সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক — ১০০.০০
- শেকল ভাঙা সংস্কৃতি — ৬০.০০
- প্রমিথিউসের পথে — ৩৫.০০
- লেখালিখি — ২০০.০০
  অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুণ্ডু, ২৯/ ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট)। বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০০৩১। জ্ঞানের আলো, যাদবপুর কফি হাউস, ৮বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে।